গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ ১ সংখ্যা ৩ - ৯ আগস্ট ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

নিম্নগামী সংস্কৃতি ও যুক্তিহীন মানসিকতা ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করছে

শিবদাস ঘোষ

[৫ই আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসকে সামনে রেখে ১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল তাঁর ভাষণের একটি নির্বাচিত অংশ এখানে প্রকাশ করা হল।]

"... এখন, এই ফ্যাসিবাদ কী — এটাকে ভাল করে বুঝতে হবে। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আমাদের দলের একটা বক্তব্য আমরা সেই ১৯৪৯ সাল থেকে বারবার বলে আসছি। একদল লোক আছেন, যাঁরা প্রশাসনের উগ্র মূর্তিটাকেই ফ্যাসিবাদ বলেন, একনায়কত্বকেই ফ্যাসিবাদ বলেন। মনে রাখা দরকার, একনায়কত্ব — মিলিটারি একনায়কত্ব হয়, একনায়কত্ব 'ক্যুপে'র দ্বারাও তৈরি হয়। তাছাড়া, অত্যাচার সমস্ত জনস্বার্থবিরোধী প্রশাসন ব্যবস্থাতেই হয়, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীরা করে। কিন্তু, ফ্যাসিবাদ তার চেয়েও দুর্ধর্ষ। শুধু অত্যাচার একটা দেশের এত ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে একটি সর্বাত্মক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান। একদিকে সে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোকে মেরে দিয়ে তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, মানুষের জ্ঞানবিদ্যাবুদ্ধিকে কারিগরিমুখী করে তোলে, অর্থাৎ দেশে একদল 'টেক্‌নোক্র্যাট' (শিক্ষিত কারিগর) সৃষ্টি করে — যারা মানবিক লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত, মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি যাদের কোন দায়িত্ববোধ নেই, যারা চাকুরিকে এবং গোলামিকেই সর্বস্ব বলে মনে করে, পয়সার বিনিময়ে যারা যা কিছু করতে পারে, এবং এইভাবে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিদ্যাকে তারা প্রবাহিত করে। অপরদিকে যত অধ্যাত্মবাদ, সেকেলে যত রকমের কুসংস্কার, যত যুক্তিহীন মানসিকতা এবং অন্ধতাকে গড়ে তোলে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ, তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণা এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরি বৈজ্ঞানিক বিদ্যার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এরকম ঘটনা যখন দেশে ঘটে, তখন যুক্তিবাদী মন দেশে মরে যায়।

তাই বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কেও আমি হুঁশিয়ার করে বলেছিলাম— যে বামপন্থীরা শক্তিবৃদ্ধির জন্য আলাপ-আলোচনার দ্বার বন্ধ করে দিয়ে গায়ের জোর প্রয়োগ করার নীতি গ্রহণ করে, যেহেতু তাদের শক্তি এবং দলবল বেশি বলে তা তখনকার মত 'ডিভিডেন্ড' (সুবিধা) দেয়; তারা কাউকে মুখ খুলতে দেয় না, কোন যুক্তিতে কর্ণপাত করে না, তাদের কর্মীরা নিজেরা যুক্তি করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং অপর মানুষের মধ্যেও সেই মানসিকতা নষ্ট করে দেয় — তারা কি জানে তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া কী? অসম্ভব মনে হলেও বাস্তব সত্য এই যে, যারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, যারা কমিউনিজমের কথা বলছে, যারা বামপন্থার কথা, সংগ্রাম-বিপ্লবের কথা বলছে এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে, তারাই আবার তাদের আচার-আচরণের দ্বারা এমন একটা যুক্তিহীন মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করছে যার পরিণতিতে গিয়ে সেই বামপন্থারই কবর খোঁড়া হবে, ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান হবে। কারণ, দেশের জমিতে যখন যুক্তিবাদী মন মরে যায়, তখনই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা সমাজজীবনে প্রবেশের সহজ রাস্তা সৃষ্টি হয়। একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষে মানুষকে 'ফ্যানাটিক' (চরম উগ্র) করা, অন্যদিকে পুরনো ঐতিহ্যবাদ এবং ভাসাভাসা সমাজতন্ত্র, বিপ্লব, আর প্রগতির স্লোগান — এই তিনটিকে যদি একত্রে মেলানো যায়, তাহলেই একটা দেশে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি হয়। মনে রাখা দরকার, শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করে একমাত্র তখনই এই তিনটিকে সুন্দরভাবে মেলাতে পারে, যখন দেশে সত্যই যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মনোভাব সমাজজীবন থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থাতেই ফ্যাসিবাদ গড়ে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ।

তাই আমি বামপন্থীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলাম যে, কংগ্রেস এবং শাসকশ্রেণীর দল দেশের মধ্যে এরকম যুক্তিহীন মানসিকতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করবেই। তারা তো চাইবেই, এ ধরনের মানসিকতা গড়ে উঠুক। কিন্তু, বামপন্থীরা

চারের পাতায় দেখুন

নন্দীগ্রামে আবার সশস্ত্র হামলা

৩০ জুলাই প্রতিবাদ দিবসে
জেলায় জেলায় বিক্ষোভ, অবরোধ

নন্দীগ্রাম আবার আক্রান্ত হল, রক্ত ঝরল, প্রাণহানি ঘটল। ২৭ জুলাই সিপিএম সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যখন বলেছিলেন, 'নন্দীগ্রামে তাঁরা মুক্তাঞ্চল চলতে দেবেন না, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন', সেটা যে নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণের প্রতি হুমকি ছিল, তা বুঝতে এস ইউ সি আই-এর অসুবিধা হয়নি। ২৮ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছিলেন, এই 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার' অর্থ কী, তা ভুক্তভোগী মানুষ জানেন। প্রভাস ঘোষ আরও বলেন, নন্দীগ্রামের কানুনগোচক, অধিকারীপাড়া ও তেখালি ব্রিজের ওপারে দক্ষিণ দিকে সিপিএম কয়েকশ' রাইফেলধারী ক্রিমিনাল জড়ো করেছে, তারা যে কোনও সময় আবার নন্দীগ্রামের মানুষের উপর নৃশংস হামলা চালাবে। ২৯ জুলাই সকালে যথারীতি খবর আসে যে, হলদিয়া নির্বাচনের 'বিজয় মিছিল' করার জন্য সিপিএম নন্দীগ্রাম বাজারে ক্রিমিনালদের জড়ো করছে, অন্যদিকে খেজুরি ও হলদি নদীর ওপারেও সশস্ত্র বাহিনীর জমায়েত ঘটছে। এভাবেই আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে সিপিএমের উদ্দেশ্যই ছিল প্ররোচনা সৃষ্টি করা, যাতে কিছু ঘটলে তার দায় নন্দীগ্রামের জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। স্বভাবতই যাদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত জনগণ এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, জনগণ যদি দেখে সেই খুনি ও ধর্ষণকারীরাই সিপিএমের জয়ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ্যে পুলিশের সামনেই বুক ফুলিয়ে মিছিল করছে, তবে তা জনগণের মধ্যে আশঙ্কা সৃষ্টি করবেই, প্ররোচনা সৃষ্টি

দুয়ের পাতায় দেখুন

গণদাবীর ওয়েবসাইট

www.ganadabi.in

এই ওয়েবসাইটে গণদাবীর বর্তমান সংখ্যা এবং পুরনো কিছু সংখ্যা পাওয়া যাবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং পার্টির সদ্য প্রকাশিত পুস্তিকাগুলিও পাওয়া যাবে।

সিইএসসি'র বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে গ্রাহক বিক্ষোভ

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গোয়েঙ্কা পরিচালিত সিইএসসি'র হাতে ১৬৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা বাড়তি উপহার তুলে দিল ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরের জন্য বিদ্যুৎ মাশুল ঘোষণা করে। এর ফলে সাধারণ গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প সহ সর্বস্তরের গ্রাহকদের বর্ধিত হারে বিল দিতে হবে। বাস্তবে গত এপ্রিল মাস থেকে এই বর্ধিত হার অনুযায়ী হিসাব করে সেই টাকা বকেয়া হিসাবে বর্ধিত বিলের সঙ্গে আদায় করা হবে। অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ২৮ জুলাই সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসে রাজ্যের জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হন। কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে মিছিল করে ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলের সামনে পৌঁছালে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। ঐখানেই বিদ্যুৎমন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করে গ্রাহকেরা বিক্ষোভ দেখান।

কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষোভস্থলে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি বলেন,

দুয়ের পাতায় দেখুন

২৮ জুলাই কলকাতায় বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুত্তলে আগুন দিচ্ছেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি

যৌনশিক্ষার প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশে বিক্ষোভ

এড্‌স্ রোগ প্রতিরোধের নামে হাইস্কুল এবং ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে যৌনশিক্ষা চালু করার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস যৌথভাবে গত ১৪ জুলাই জৌনপুর জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শত শত ছাত্র-যুব-মহিলা-অভিভাবকদের এক মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ডি এম অফিসে পৌঁছায়। মিছিলে দাবি ওঠে — 'যৌনশিক্ষা চালু করা চলবে না', 'যৌনশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করা চলবে না', 'ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া বন্ধ কর', প্রেমচন্দ-ভগৎ সিংয়ের দেশে যৌনশিক্ষা চালু করা চলবে না।', 'যৌনশিক্ষা নয়; গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালু কর।'

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এ আই ডি এস ও'র পূর্বতন জেলা সভাপতি কমরেড ইন্দ্রকুমার শুক্ল। ছাত্র, যুব, মহিলা নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদক কমরেড জগদীশচন্দ্র আহ্বানা। সবশেষে দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি এন সিং বলেন, 'মরণাপন্ন পুঁজিবাদ বাঁচার তাগিদে যে কোনও ঘৃণ্য কাজ করতে পারে। শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা নীতি-নৈতিকতাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই তারা যৌনশিক্ষার নামে ফ্যাসিস্ট হামলা চালাচ্ছে।'

এরপর সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে উপরোক্ত দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

বারাসাত হাসপাতালে এম এস এস কর্মীদের ওপর পুলিশি আক্রমণ

বারাসাত হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভরত এ আই এম এস এসের মহিলা কর্মীদের ওপর এসডিও নিজেই লাঠি চালালেন, ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর পুলিশবাহিনী; মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানি করলা। আহত হলেন মোট ১৩ জন; গুরুতরভাবে আহত হলেন শিউলি দাস।

গত ১৩ জুলাই সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে স্কুলস্তরে 'জীবনশৈলী'র নামে যৌনশিক্ষা চালুর প্রতিবাদে জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে যখন শতাধিক মহিলা কর্মীর বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি চলছিল তখনই খবর আসে, বারাসাত জেলা সদর হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা চলছে। তৎক্ষণাৎ এ আই এম এস এস-এর কর্মীরা বারাসাত শহরে প্রতিবাদ মিছিল করে এসে হাসপাতাল সুপারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। ঘটনার খবর পেয়েই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসডিপিও, এসডিও বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন এবং অতর্কিতে মহিলা পুলিশ ছাড়াই এসডিও নিজেই তাঁর বাহিনী নিয়ে লাঠিচার্জ করতে শুরু করেন। পুলিশ শিখা দাস, রত্না দত্ত সহ নয়জনকে গ্রেপ্তার করে এবং ভ্যানের মধ্যেও ব্যাপক লাঠি চালায়। উপস্থিত সাংবাদিকরাও পুলিশদের দ্বারা নিগৃহীত হন। পুলিশের এই বর্বর অত্যাচারের প্রতিবাদে উপস্থিত রোগী ও জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সাংবাদিকরা এসডিও-র বরখাস্তের দাবিতে ও মহিলাকর্মী সহ সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদের বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐ হাসপাতালের অভ্যন্তরে কিছু হাসপাতাল কর্মী, স্থানীয় সিপিএম নেতা ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে গড়ে ওঠা দালালচক্রের ফাঁদে পড়ে প্রতিদিন অসহায় রোগীদের নাভিশ্বাস উঠছে। এই পুলিশি জুলুম ও শিশুমৃত্যুর প্রতিবাদে পরদিন ১৪ জুলাই এস ইউ সি আই জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেওয়া হয়। ২১ জুলাই শিশুমৃত্যুর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের শাস্তি, এসডিও-র বরখাস্তের দাবিতে, বারাসাত জেলা শহর হাসপাতালে দালালচক্রের বিরুদ্ধে এবং সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে বারাসাত সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে বিকাল ৪টায় এক নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেওয়া হয়।

বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে গ্রাহক বিক্ষোভ

একের পাতার পর

সিইএসসি প্রতি বছরেই লাভ করেছে। গত বছর তাদের অন্তত ৫০০ কোটি টাকা লাভ হয়েছে, তার উপর এবছর এই বিরাট পরিমাণ টাকা সাধারণ গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোয়েঙ্কার হাতে তুলে দিল কমিশনের ব-কলমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাদের পুঁজিপতি তোষণকারী বিশ্বায়নের নীতির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে এই মাশুলবৃদ্ধির ঘোষণায়। ক্ষুদ্রশিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর এবার নতুনভাবে ফিক্সড চার্জ বসানো হয়েছে। গৃহস্থ এবং ছোট দোকান-দারদের ইউনিট প্রতি চার্জ বেড়েছে। এবছরই প্রথম গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিন ঋতুতে তিন ধরনের মাশুল চালু করে কৌশলে দাম বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।

তিনি বলেন, সারা বছর ধরে ভয়ঙ্কর লোডশেডিং লো-ভোল্টেজ চলছে। পরিষেবা দিতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ সিইএসসি'কে আইন অনুযায়ী শাস্তি না দিয়ে শত শত কোটি টাকা উপহার দেওয়া হল। অ্যাবেকা হিসাব করে কমিশনকে দেখিয়েছে, স্বচ্ছতা অবলম্বন করলে এবং দুর্নীতি বন্ধ হলে গড় মাশুল ২ টাকা ইউনিট হয়। কমিশন তা না করে গোয়েঙ্কা এবং সরকারের নির্দেশে ৩.৭৫ টাকা করেছে। অবিলম্বে চূড়ান্ত জনবিরোধী এই মাশুল ঘোষণা প্রত্যাহার করে সিইএসসি'র মাশুল পুনঃনির্ধারণ করতে হবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্প ও গৃহস্থ গ্রাহকদের ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে, তা না হলে রাজ্য সরকারকে বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ ধারা প্রয়োগ করে বর্ধিত মাশুল বাতিল করতে হবে। নয়তসাধারণ গ্রাহকদের নিয়ে এলাকায় গ্রাহক বিক্ষোভ, কাউন্টার অবরোধ চলবে। এতেও দাবি মানা না হলে গ্রাহকরা বিল বয়কট আন্দোলন করতে বাধ্য হবেন।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুরের প্রবীণ এস ইউ সি আই সদস্য কমরেড রামদুলাল সরকার কলকাতার হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে মাসাধিককাল চিকিৎসায় থাকাকালীন অবস্থায় গত ১০ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

৬০-এর দশকের প্রারম্ভে তিনি এস ইউ সি আই দলের আদর্শের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতি ও নৈতিকতার সন্ধান পেয়ে দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন এবং নিজেকে একজন ন্যায়পরায়ণ, ছাত্রবৎসল শিক্ষকরূপে গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে 'দুলু মাস্টারমশাই' রূপেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রতি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও বিশিষ্ট নাগরিকদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এতটাই ছিল যে, মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দলে দলে তাঁরা ছুটে আসেন তাঁর বাসভবনে। শিক্ষক জীবনে তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যত্নের সাথে লেখাপড়া শেখাতেন শুধু নয়, তাদের বড় চরিত্রের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলারও চেষ্টা করতেন। তিনি আজীবন দলের একজন একনিষ্ঠ, নীরব কর্মী হিসাবে কাজ করে গেছেন। দলের বড় কর্মসূচি বা নির্বাচনের সময় কত দ্রুততার সাথে সুন্দরভাবে দেওয়াল লিখন, হোর্ডিং, ফেস্টুন ইত্যাদি করা যায়, সে বিষয়ে তিনি প্রায় গবেষণা করতেন বলা যায়। এর মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও শিল্পীমনেরই পরিচয় পাওয়া যেত। তিনি নিজেও লিখতেন ও আঁকতেন।

জয়নগর-মজিলপুরের নাগরিকদের পক্ষ থেকে প্রয়াত কমরেড রামদুলাল সরকার স্মরণে ২২ জুলাই পি সি পাল ইনস্টিটিউশনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত কমরেডের বহু গুণগ্রাহী স্মরণসভায় এসেছিলেন, অনেকেই গভীর আবেগের সাথে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। তাঁরা বলেন, তাঁর প্রয়াণে জয়নগর-মজিলপুর হারাল সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবান, সৎ, মানুষ তৈরির একজন একনিষ্ঠ শিক্ষককে এবং একজন নিষ্ঠাবান, আত্মপ্রচারবিমুখ নীরব সমাজকর্মীকে। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কমরেড কার্তিক সাহা।

নন্দীগ্রামে আবার সশস্ত্র হামলা

একের পাতার পর

হবেই। ২৯ জুলাই সকালে সিপিএম নন্দীগ্রামে যাদের নিয়ে মিছিল করে, তাদের অধিকাংশই সেইসব ক্রিমিনাল, যারা ১৪ মার্চের গণহত্যা ও গণধর্ষণে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ছিল। ফলে, সিপিএমের ঐ মিছিল শেষ হতেই খুনি ও ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে নন্দীগ্রামের মানুষের মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিল নন্দীগ্রাম বাজার দিয়ে যাওয়ার সময়, সিপিএমের পার্টি অফিস থেকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঐ মিছিল লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। প্ররোচনা সৃষ্টির মতলব হাসিল হয়, মিছিলের মানুষ প্রবল উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ সময় পুলিশ বোমা নিক্ষেপকারী সিপিএম আশ্রিত ক্রিমিনালদের গ্রেপ্তারের পরিবর্তে মিছিলের উপরই ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। একদিকে হামলাকারী সিপিএমের বোমা, অন্য দিকে পুলিশের লাঠির আঘাতে মহিলা-পুরুষ মিলে ২৪ জন আহত হয়, তাদের নন্দীগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এ সময়ই পরিকল্পনামতো তেখালি ব্রিজের ওপার থেকেও সিপিএম বাহিনী নন্দীগ্রামে গুলি-বোমার আক্রমণ শুরু করে। সৃষ্টি হয় চূড়ান্ত আতঙ্কের পরিস্থিতি।

২৮ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছিলেন, সিপিএমের 'শান্তি প্রতিষ্ঠা'র আসল লক্ষ্য হচ্ছে, পুলিসের সাহায্যে ক্রিমিনালদের আবার ঢুকিয়ে নন্দীগ্রামের মানুষের মাথা নত করানো। ঘরছাড়াদের নিয়ে সিপিএম মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। বাস্তবে নন্দীগ্রাম ১নং ব্লকের ৭৯টি পরিবারের ৩১৯ জন এখনও ঘরছাড়া। এদের মধ্যে অনেকেই ক্রিমিনাল, যারা ১৪ মার্চের পর তাদের পরিবার নিয়ে ঘর ছেড়েছিল। এদের মধ্যেও অনেকে ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। নন্দীগ্রামের মানুষ বলেছে, ক্রিমিনালদের ছাড়া অন্য সবাইকে তারা গ্রামে ঢুকতে দেবে। অথচ সিপিএম ঘরছাড়াদের সাহায্য করার নামে চাঁদা তুলছে এবং সেই টাকা দিয়ে গোলা-বারুদ যোগান দিচ্ছে।

সরকার যদি সত্যিই শাস্তি চায় তবে দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি, খুনি ও ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার, খেজুরির ক্যাম্পে জড়ো করা ক্রিমিনালদের অপসারণ, নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ এবং আন্দোলনকারীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার— এই দাবিগুলি মেনে নিচ্ছে না কেন? একমাত্র এই পথেই তো যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

সিপিএম নেতৃত্ব যে পথ নিয়েছেন তা আগুন নিয়ে খেলার সামিল। নন্দীগ্রামের মানুষের দৃঢ় শপথ, তারা প্রয়োজনে আরও প্রাণ দেবে, কিন্তু লাঠি-গুলির কাছে মাথা নত করবে না। ৩০ জুলাই ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির ডাকে নন্দীগ্রামে ১২ ঘণ্টার সর্বাত্মক বনধ পালিত হয়েছে। রাজ্যজুড়ে এস ইউ সি আই প্রতিবাদ দিবস পালন করে এই হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। জনসাধারণের প্রতি আবেদনে এস ইউ সি আই বলেছে, তাদের সমর্থনের উপর ভিত্তি করেই নন্দীগ্রামের মানুষ যে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালাচ্ছে, রাজ্যবাসী যেন যেকোনও আক্রমণে তেমনভাবেই নন্দীগ্রামের পিছনে দাঁড়ান।

সিপিএম নেতৃত্বের বোঝা উচিত, নন্দীগ্রাম প্রমাণ করেছে জনগণের আন্দোলনের শক্তি সিপিএমের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি। তাদের এই হুমকি হামলা বেশি দিন চলতে পারে না।

সরকারি অবহেলায় সৃষ্ট মেদিনীপুরের বন্যায়

লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপর্যস্ত

সরকারি অবহেলায় যে বন্যা মেদিনীপুরকে ভাসিয়ে দিয়েছে, মানুষকে চরম দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তার খবর সরকারকে বিচলিত করেনি। এই চরম দুর্গতির বিবরণ সংবাদমাধ্যমেও স্থান পায়নি। বন্যার পর একপক্ষ কাল অতিক্রান্ত হলেও, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার মানুষজনের চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া কাটেনি। সর্বত্র আতঙ্ক — আবার নিম্নচাপ, আবার বর্ষা, এই বুঝি বন্যা এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সর্বস্ব। ডি ভি সি, কংসাবতী ইত্যাদি জলাধার থেকে লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া, নদীবাঁধগুলির দৈন্যদশা, নদী ও খাল-বিল সংস্কারের অভাবে মজে যাওয়া — ইত্যাদি হল এই বন্যার কারণ। বয়স্করা বলছেন, গত ১০০ বছরে এত বড় বন্যা হয়নি। বন্যায় ধান, পাট, মাদুর কাঠি, পান, মাছ সহ সকল প্রকার শাক-সবজিও ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়েছে। গ্রামের পর গ্রামে কাঁচা ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে হাজারে হাজারে। আদিবাসী পল্লীগুলির ঝুপড়ি বা ছোট ছোট ঘরগুলি হয় ভেঙে গেছে, নয় জলের স্রোতে ভেসে গেছে। অধিকাংশ বাড়ির আসবাবপত্র, হাঁড়ি-কড়া-খুন্তি ইত্যাদি রান্নার সরঞ্জাম, পরনের কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, সারা বছরের জন্য জমানো ধান, চাল, কলাই, মাদুর কাঠি, ইত্যাদি কোন কিছুই রক্ষা করা যায়নি; হয় জলের স্রোতে ভেসে গেছে, নতুবা মাটি চাপা পড়েছে। পড়ুয়াদের বই-খাতা-কলমেরও একই হাল। প্রতিটি গ্রামে সত্তর শতাংশ ছোট-বড় বাড়ি ভেঙে পড়েছে। যেগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তার অধিকাংশ ভেঙে পড়বে খুব শীঘ্রই। পাকা বাড়িগুলিতেও ফাটল দেখা দিয়েছে। সবং, নারায়ণগড়, পটাশপুর, পিংলা, বেলদা, ইত্যাদি ব্লকের হাজার হাজার পরিবার মাদুর শিল্পের উপর নির্ভরশীল। সেই মাদুর চাষ এবার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে এই চাষ করে চাষীরা। তারা এখন সর্বস্বান্ত। জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে, দেওয়ালে চাপা পড়ে, সাপের কামড়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে হতাশায় প্রাণহানির সংখ্যা বহু। বন্যার এই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে অসহায় মানুষ যখন গাছের ডালে, ভেঙে যাওয়া ঘরের চালে, কোথাও কোন উঁচু ঢিবিতে অন্নজলহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, প্রশাসন তখন নির্বিকার। ত্রাণ তো দূরের কথা, উদ্ধার করার জন্য স্পিড বোট, কিংবা যন্ত্রচালিত নৌকার ব্যবস্থা করেনি জেলা প্রশাসন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং, পিংলা, নারায়ণগড়, দাসপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, কেশিয়াড়ি, দাঁতন, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর, জামবনী, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর সদর; পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, ময়না, ভগবানপুর, এগরা, পটাশপুর ইত্যাদি ব্লকের ৫০ লক্ষাধিক মানুষের জীবন আজ এইভাবে বিপর্যস্ত।

মন্ত্রী-নেতাদের আনাগোনা, দুর্গত এলাকায় বসানো স্বল্পসংখ্যক ত্রাণ-শিবির, ইত্যাদি জল নামার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হচ্ছে। নিজ বাসস্থানের ধ্বংসস্তূপ এবং আবাদ করা ফসলের নিশ্চিহ্ন অবস্থা দেখে অধিকাংশই বাক্‌রুদ্ধ। এই অবস্থায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। সারা বর্ষাকাল জুড়ে একখানা ত্রিপলের ছাউনি, কিংবা একখানা চালায় পরিবারের সকলে গবাদি পশু ইত্যাদি নিয়ে বসবাস করবে কী করে; খাদ্য কোথায়, চাষাবাদই বা হবে কী করে, ঘর কী করে তৈরি হবে — এসবই আজ দুর্গত মানুষের জিজ্ঞাসা। সরকার পক্ষ নির্বিকার। এই কারণেই শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা বন্যাদুর্গত এলাকায় ঢুকতে পারছেন না। ক্ষোভ-বিক্ষোভ আজ সর্বত্রই। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেদিনীপুর শহরে এসে ঠাণ্ডাঘরে মিটিং করে ফিরে গিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া রাতুলিয়া ইত্যাদি দু'একটি জায়গায় গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রও তাঁর নিজ বিধানসভা কেন্দ্র নারায়ণগড়ের মান্দার হরিপুর, পাহাড়পুর ইত্যাদি যে দু'তিনটি গ্রামে পৌঁছেছেন, সেখানেই 'এতদিনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কেন হল না' — এই নিয়ে বিক্ষোভ ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।

এবারের বিধ্বংসী এই বন্যায় জনজীবনের এই চরম বিপর্যয়কে সরকার নিতান্তই সাধারণ দৃষ্টিতে দেখছে। এ পর্যন্ত সারা রাজ্যে তারা ত্রাণকার্যে মঞ্জুর করেছে মাত্র ১৯ কোটি টাকা, যার অধিকাংশই খরচ হয় প্রশাসনিক খাতে — অর্থাৎ, মন্ত্রী-আমলাদের হেলিকপ্টারে যাতায়াত, গাড়ি ছোটানো, মিটিং ইত্যাদিতে। তাঁরা রাজ্যে দুর্গত মানুষের সংখ্যা ধরেছেন ৪০ লক্ষ, বাস্তবে তা ৮০ লক্ষের উপর। এই টাকা মাথাপিছু ভাগ করলে ২০ টাকার বেশি হয় না। অথচ এই সরকার পুঁজিপতিদের কর ছাড় দেয় হাজার হাজার কোটি টাকা। এই সেদিন সিঙ্গুরে টাটার জন্য জমি কিনতে সরকারি কোষাগার থেকে মঞ্জুর করা হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই সরকার কাদের সরকার। এখন জনরোষের সামনে পড়ে বন্যার স্থায়ী সমাধানের কথা তাঁরা বলছেন। কিন্তু জল নেমে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁরা তা ভুলে যাবেন।

১৯৭৮-এর বন্যার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দু'জনেই সবং থানার দেহাটি এসেছিলেন। কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, বাগুই সংস্কার করে স্থায়ী বন্যা রোধের কথা বলেছিলেন। ৮০-র দশকের গোড়ায় রাজ্যের সেচমন্ত্রী প্রভাস ফাদিকারও রূপোর কোদালে মাটি কেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। আজ ৩০ বছর পর একই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ওই এলাকার মানুষদের। আজ আবার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখার্জিরা একই কথা শোনাচ্ছেন। কাগজেপত্রে লেখা হচ্ছে, এক লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হবে শুধু এই রাজ্যের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য, সমস্যা শুধু প্ল্যান কে করবে, কেন্দ্র না রাজ্য — এই নিয়ে! সরকারের আন্তরিকতা নিয়েই আজ প্রশ্ন। উদ্ধার, ত্রাণ, বন্টন কোন কাজেই তাদের আন্তরিকতা লক্ষ করা যায়নি। বহু জায়গায় এখনও ত্রাণ পৌঁছায়নি, পৌঁছালেও বড়জোর ৫/৬ কেজি চাল। ভাইরাল ফিভার, জলবাহিত নানা রোগ বহু জায়গায় মহামারীর রূপ নিচ্ছে। সেখানে সরকারের কোনও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না।

এই বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রয়োজন ছিল ঃ ১) গৃহহারা মানুষদের জন্য মাথার ওপর ছাউনির ব্যবস্থা করা। পর্যাপ্ত পরিমাণে পলিথিন নয়, ত্রিপল সরবরাহ করা; ২) শিশুখাদ্য সহ খাদ্যের ব্যবস্থা করা; ৩) খেতমজুরদের কাজ নিশ্চিত করা; ৪) চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে জরুরি ভিত্তিতে সাপে কাটার ওষুধ মজুত করা; ৪) পানীয় জলের ব্যবস্থা করা; ৫) পরবর্তী চাষাবাদের জন্য বিনামূল্যে বীজ-সার-ওষুধ-কীটনাশক সরবরাহ সহ পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা। এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনের আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব। এলাকায় যতটুকু ত্রাণ যাচ্ছে, তা নিয়ে চলছে দলবাজি, স্বজনপোষণ। বহু জায়গায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে এস ইউ সি আই-এর স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্ধার ও ত্রাণ সংগ্রহ করে বিলিবন্টনের ক্ষেত্রে নারায়ণগড়-সবং-পিংলা-মেদিনীপুর সদর-কেশিয়াড়ি ইত্যাদি ব্লকে প্রথম দিন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অতি বর্ষণকে বন্যার কারণ হিসাবে দেখিয়ে, 'এ রকম হতেই পারে' — এই বোঝাতে সরকার ব্যস্ত। এটি একটি প্রতারণা। এই কথা বলে সরকার এত ফসলহানি, প্রাণহানির দায়দায়িত্ব এড়াতে চায়। দেশের নদীনালা-খালবিল সব যখন শূন্য, তখন প্রথম বর্ষাতেই সবকিছু উপছে পড়ে এত বড় বিপর্যয় কী করে ঘটল, সরকার তার কারণ বলছে না। আসল কারণ সেই একই। নদী-খাল-বিল সংস্কারের অভাবে পলিবালি জমে মজে গিয়েছে। সেগুলি জলধারণ ও বহন ক্ষমতা হারিয়েছে।

এবার পশ্চিম মেদিনীপুরে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক হচ্ছে সবং, নারায়ণগড়, পটাশপুর, ভগবানপুর। এই ব্লকগুলিতে বন্যা হওয়ার মূল কারণ কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, বাগুই এবং তার শাখা খালগুলির সংস্কারের অভাবে পলিবালি জমে মজে যাওয়া অবস্থা। বারবার দাবি ওঠা, এমনকী আন্দোলনের চাপে ১৯৯৫ সালে সরকার থেকে ৩৭ কোটি টাকার একটি স্কিম হওয়া সত্ত্বেও সংস্কারের কাজ করা হয়নি। নারায়ণগড় থানার পোস্তাপুল স্থানে কেলেঘাই নদী ৬০ নং জাতীয় সড়ক অতিক্রম করেছে। পূর্বে এখানে সব জল এই জায়গায় এসে জমা হত এবং ধীরে ধীরে তা নিচে নামত। কিন্তু নতুন করে জাতীয় সড়ক তৈরি হওয়ায় সেই সেতু বিস্তৃত আকার নিয়েছে। বৃষ্টির সাথে সাথে ওপরের সব জল অতি দ্রুত ঐ পুল অতিক্রম করে নারায়ণগড় ব্লকের ৪, ৬, ১৩, ১৪, ১৫ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ গ্রামকে প্লাবিত করছে। কেলেঘাই ও বাগুই নদী মজে থাকার ফলে ঐ বিপুল জলরাশি সমুদ্রে চলে যেতে পারছে না। উল্লেখ্য যে, এই নদী সংস্কারের কাজ নিয়ে জেলা পরিষদ ও সেচ দপ্তরের মধ্যে ঝগড়া তুঙ্গে। এবছরই কেলেঘাই ও বাগুই নদী সংস্কারের জন্য সরকার ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ঠিকাদারও নিযুক্ত হয়। কিন্তু সংস্কারের কোনও কাজ হয়নি। সরকার ভেড়ি বাঁধগুলিকে মজবুত ও উঁচু করছে। এজন্য ২/১টি গ্রাম হয়তো রক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু উপরোক্ত কারণে এই বন্যা বিস্তৃত অঞ্চলকে গ্রাস করছে ও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। এর ফলেই খড়সি গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়সি চকমকুন্দ, দক্ষিণ পলাশি, প্রতাপপুর, লাগাডাঙা, পাহাড়পুর, গোপীনাথপুর, দুড়িয়া, দাঁড়িধার, নারায়ণগড় পঞ্চায়েতের কাঠালিয়া কুসুমডাঙা, পোলসিটা, রাইপুর, নরসিংহবাড়ি, কুশবসান গ্রামপঞ্চায়েতে দাউদপুর ডাঙারপাড়া, দেউলবাড় জটিয়া, আদমপুর, চাউলকুন্ডি ইত্যাদি গ্রামের ঘরবাড়ি সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

কেলেঘাই নদীর উর্ধ্ব অংশের গ্রামগুলি যখন জলের নিচে, তখন এই নদীরই নিম্ন অংশে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে নদীতে জলের কোনও প্রবাহ নেই বললেই চলে। কারণ, নদীর এই অংশ খননের অভাবে পলিবালি জমা হয়ে উঁচু ডাঙায় পরিণত হয়েছে। লাঙলফাটা থেকে কাঁটাখালি পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার নদীপথ জুড়ে নদীর দু'দিকে বকচরে উঁচু বাঁধ তৈরি করে মাছ চাষের বড় বড় ভেড়ি তৈরি হয়েছে। বহু ইটভাটা তৈরি হয়েছে। মাঝে কয়েক মিটার মাত্র জয়গায় জল যাওয়ার ব্যবস্থা রেখে দু'দিক থেকে বড় বাঁধ দিয়ে পারাপারের রাস্তা তৈরি হয়েছে কাঁটাখালিতে। এরপর ঢেউভাঙা পর্যন্ত অবস্থা আরও করুণ। নদীর মাঝ বরাবর একটি সরু নালার মতো জায়গা দিয়ে জল প্রবাহিত হয়। বাকি দু'দিকে বিস্তীর্ণ বকচরগুলি বালি জমে উঁচুটিবিতে পরিণত হয়েছে। উপরের এই বিপুল জলরাশিকে দ্রুত সমুদ্রে নিয়ে ফেলার কোন ক্ষমতা নদীর নিম্নাংশের নেই। তাই এই বন্যা ও লক্ষ লক্ষ মানুষের এই দুর্দশা। এ কি মানুষসৃষ্ট দুর্দশা নয়?

জমিদারি বাঁধ ও নদীবাঁধগুলি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ। মেরামতির ক্ষেত্রেও সরকারি দপ্তরগুলির মধ্যে একই কাজিয়া। টাকার পুকুরচুরি। বর্ষার ঠিক মুখে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করা হয়, বর্ষা হতে না হতেই সেই মাটি নদীতে এসে পড়ে। টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু বাঁধ মেরামতির কাজ হয় না কিছুই। সবংয়ে খড়িকায় কেলেঘাই নদীবাঁধ ভেঙে, এড়ালে কপালেশ্বরী নদীবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পিংলাবাঁধ ভেঙে তিনটি অঞ্চলে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাজারবাগান, পালজাগুল এলাকায় কাঁসাই নদীর বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং ফসল নষ্ট ও ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে। বহু আদিবাসী পল্লীর মানুষ ঘর হারিয়ে চরম সঙ্কটে পড়েছে।

এবারের বন্যায় ঘাটাল মহকুমার চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। ৫ জুলাই রাত্রেই ঝুমিনদীর বাঁধ ভেঙে ঘাটাল ব্লকের মননুকা পঞ্চায়েতে বন্যার সৃষ্টি হয়। পরপর শিলাবতী ও কংসাবতীর বাঁধ ভেঙে চন্দ্রকোনা ও দাসপুর ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্লাবিত হয়েছে। প্রশাসনের তরফে আগাম কোনও সতর্কতা নেই। নদীবাঁধগুলির ফাটল মেরামতির কাজে গ্রামবাসীরা যখন জীবনপণ লড়ছে — সেচদপ্তর, প্রশাসন তখন নির্বিকার। মহকুমার কয়েক হাজার পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। বহু দিনের তৈরি হওয়া ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, যা এখন ৩৫০ কোটি টাকার একটি সংশোধিত প্ল্যানে রূপ পেয়েছে, তা কার্যকর না করার কারণেই এই বিপর্যয়। সমগ্র এলাকা আজ এই প্রকল্প রূপায়ণের দাবিতে অগ্নিগর্ভ।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ দিক বরাবর বয়ে যাওয়া সুবর্ণরেখা নদী দীর্ঘকাল সংস্কারের অভাবে জল বহন করতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গোপীবল্লভপুর, সাঁকরাইল, কোলিয়ারি, দাঁতন ইত্যাদি ব্লকের নদীপাড় বরাবর গ্রামগুলির ওপর। ব্যাপক ভাঙন হয়েছে, বহু ঘরবাড়ি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাঁকরাইল ব্লকের ৩টি পঞ্চায়েত। এই নদীর ভাঙনরোধে সামগ্রিক কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই। প্রতি বছর সামান্য টাকা বরাদ্দ হয়, সেটুকুর কাজও হয় না কোনও অজ্ঞাত কারণে।

ঘাটাল মহকুমা এবং কেলেঘাই কপালেশ্বরী অববাহিকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে সর্বাগ্রে চাই আন্তরিকতা। চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা। বন্যার সময় সকলেই একথা বলেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেই যত বাধা। এই দুই এলাকায় স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণে মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়েছিল বহু বছর আগে। কিন্তু বছরের পর বছর তা খাতা- কলমেই থেকেছে। ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প অনুমোদন করে। ১৯৮২ সালে রাজ্যের তৎকালীন সেচমন্ত্রী এই মাস্টার প্ল্যানের উদ্বোধনও করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কার্যকরী করা হয়নি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শন করে মাস্টার প্ল্যানটির সংশোধন করে ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের রূপরেখা পেশ করে। কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগুই নদী সংস্কারের জন্যও জনগণের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ১৯৯৫-৯৬ সালে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশন ৩৭ কোটি টাকার একটি স্কিম ঘোষণা করে। সামান্য এই অর্থবরাদ্দের মধ্যে কোন্ সরকার কত দেবে — তা নিয়ে দ্বন্দ্বের ফলে পূর্ণাঙ্গ নদী সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। রাজ্য সরকারের ১৭ কোটি টাকা দেওয়ার কথা; তারা পুরো স্কিমটি কীভাবে কার্যকর হবে, তা না ভেবে বিচ্ছিন্নভাবে দফায় দফায় কিছু টাকা বরাদ্দ করে কেলেঘাই-কপালেশ্বরী নদীতে কাজ করায়। এতে আসল কাজ কিছু হয়নি। সেটার জন্য দরকার দু'টি স্কিমের সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। চাই নদীর পূর্ণাঙ্গ সংস্কার। ঘাটালকে বাঁচাতে শিলাবতী, দামোদর, পারা, কেটিয়া সহ ছোট ছোট নদী ও খালগুলির, বিশেষত নিম্ন অববাহিকায় সংস্কার জরুরি। একই কথা সবং ও নারায়ণগড়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরাখালি, কালচিতি, বাগলা ইত্যাদি

পাঁচের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

নিজেদের দলীয় স্বার্থের জন্যও কেন এমন ধরনের আচরণ করবে? যদি করে, তাহলে সাময়িকভাবে তা তার পক্ষে লাভজনক হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে সেটাই হবে তার কবর খোঁড়ার প্রশস্ত রাস্তা। তাই যুক্তিহীন মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের চর্চা, আলাপ-আলোচনা, পরস্পরের মতের ওপর আলোচনা ও সমালোচনা এবং তর্কাতর্কির পরিবেশ থাকা দরকার। একমাত্র এ ধরনের পরিবেশ গড়ে উঠলেই শোষকশ্রেণীর কোন দলের পক্ষে জনসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। ...

...আমাদের দেশের যে সমস্ত ছাত্র-যুবকরা বামপন্থীদের ত্রুটি-বিচ্যুতিজনিত প্রতিক্রিয়া থেকে শাসক কংগ্রেসের পেছনে আজ জড় হয়েছেন, তাঁরা কি শুধু 'ইন্দিরা জয়' গেয়ে এবং বামপন্থীদের গালাগালি করে আমাদের দেশের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবেন? ফলে, তাঁদের আজ এই জিনিসটা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। তাঁরা বলছেন, কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করেছে, সি পি এম খুন দাঙ্গা করেছে, আমরা সর্বনাশ করেছি। ধরে নিন, আমরা যা করেছিলাম, তা মারাত্মক ভুল। আমরা সর্বনাশ করেছি। রাস্তা আমরা পাইনি। তাতে অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তার জন্য ইন্দিরা সমাজতন্ত্র আনবে — একথা প্রমাণ হয় নাকি? এবং তার জন্য তাকে সমর্থন করার কোন যুক্তি আছে কি? সেখানে আমরা বামপন্থীরা যদি ভুল করে থাকি, তাহলে সেই ভুলটা সংশোধন করার কথা ওঠে। অথচ, তা না করে একটা জানাশোনা রাস্তায় যে নব কংগ্রেস ফ্যাসিবাদকে সংহত করার মধ্য দিয়ে দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে, তাঁরা সেই রাস্তাকেই সমর্থন করে চলেছেন।

তাই দেখুন, তাঁদের মধ্যেও কী অদ্ভুত ধরনের যুক্তিবাদ গড়ে উঠছে। তাঁরা বলছেন, সি পি এম গুণ্ডামি করেছে, তাই তাঁরাও গুণ্ডামি করেছেন। সি পি এম গায়ের জোরে বুথ দখল করেছে, তাই তাঁরাও জোর করে বুথ দখল করেছেন এবং আর এক পা এগিয়ে গিয়ে বাক্স ভেঙেছেন। আমি শুনেছি, প্রেস-এর লোকেরাও নাকি এইভাবে যুক্তি করে যে, 'ও মশাই সুবিধে পেলে এসব সকলেই করে। ওতো সি পি এম-ও করেছে'। আমি বলি, একি অদ্ভুত যুক্তিধারা! এসব তো সেই ডাকাতের যুক্তি হল যে, 'অমুকে চুরি করেছে, তাই আমি ডাকাতি করেছি।' তা গোটা দেশটা কি চোর-ডাকাত হয়ে গেল নাকি? একজন চুরি করেছে বলে আর একজনের ডাকাতি করার অধিকার জন্মায় নাকি? তাহলে চোরকে নিন্দা করার তাদের কী অধিকার আছে? তাহলে তো ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কে কত বড় চোর হব এবং ডাকাত হব তার জন্য আমরা সকলেই লড়ালড়ি করছি। নাহলে একজন যদি চুরি করে থাকে, ডাকাতি করে থাকে, তাহলে তার আচরণ বন্ধ করার কথাই ওঠে। ...অথচ, এই ধরনের যুক্তিহীন মানসিকতা আজ প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে। আর, এই পথ বেয়েই লোকচক্ষুর আড়ালে দেশে একটা সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ গড়ে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে।

নৈতিকতার সংকট

তাই নৈতিকতার সংকটের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। একথা ঠিক যে, দেশে খাদ্য সংকট তীব্র হচ্ছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে, শিল্পোন্নয়ন হচ্ছে না, বেকার সমস্যা বাড়ছে, বিদ্যুৎ নেই — এই সমস্ত সমস্যায় আমরা ঘরে ঘরে ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু, তার চেয়েও বড় ক্ষতি, নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এবং যুক্তিহীন মানসিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমাজজীবনে যে সমস্যা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে, সেখানে ঘটছে। মনে রাখা দরকার, অভাব এবং অত্যাচারের তাড়না যতই হোক্ না কেন, তার দ্বারা একটা জাতিকে মেরে ফেলা যায় না। ব্রিটিশরা দু'শ বছরের ওপর আমাদের পদানত করে রেখেছিল। কিন্তু, গোটা জাতিটাকে মারতে পারেনি। ভিয়েতনামকে বোমা মেরে মেরে আমেরিকা মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছে এবং সেখানকার মানুষগুলোকে একেবারে মাটির তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গোটা দেশের জাতির মেরুদণ্ড ভাঙতে পারেনি। কিন্তু, আমাদের দেশের শাসক সম্প্রদায় আজ দেশে কি শুধু অর্থনৈতিক দুর্দশাই সৃষ্টি করছে?

যে যুক্তির দ্বারা তাঁরা নিজেদের অন্যায় আচরণকে সমর্থন করছেন, লোককে সমর্থন করতে বলছেন, পুলিশ যেভাবে প্রকাশ্যেই প্রতিদিন আইনকে পদদলিত করে চলছে, এবং পুলিশের এইসব আচরণকে রাজনৈতিক নেতারা এবং প্রশাসকরা যেভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন; উপরন্তু, যুক্তিহীন মানসিকতা যদি এমন স্তরে পৌঁছে থাকে যে, দেশের তরুণরাও কোন কিছু বুঝতে না চান, রাস্তাঘাটে অশালীন আচরণ করেন এবং তা দেখে বয়স্করাও চুপ করে থাকেন, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অপরের মতামত সম্বন্ধে সহনশীলতার এরূপ অভাব ঘটে থাকে, তাহলে কী প্রমাণ হয়? শুধু আমরা খেতে পাচ্ছি না এবং আমাদের অভাব — এইটেই প্রমাণ হয়? নাকি, এটাও প্রমাণ হয় যে, আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে। মনে রাখবেন, একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেতে পেলেও সে লড়ে, যদি মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু, ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ বলতে দেশে আর বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ, মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে বাধা সৃষ্টি করে।

যখন পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনও আমি এ বিষয়ে বারবার বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু, তখন আমাদের কথা কেউ শুনতে চায়নি। বরং, আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে, আমরা নাকি 'ডিস্‌রাপ্‌টার' (বিভেদকামী), আমরা ঐক্য নষ্ট করছি। ঐক্যের স্বার্থে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থেই যখনই কোন দলের কোন ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা বলতে গিয়েছি, তখনই ঐক্যবিরোধী বলে 'ব্যুয়িং' করে, সোরগোল করে আমাদের বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অথচ, সেই ঐক্য গড়ে উঠে কী হল? ঐক্য তো গড়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে সমবেত হয়েছিল। তাদের সমর্থনও যুক্তফ্রন্টের পেছনে ছিল। তা তাসের ঘরের মত উবে গেল কী করে? আমার মনে পড়ে, আমি তখনও এই বিপুল জনসমর্থনের নৈতিকতার মানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলাম যে, এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থন দেখে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তারা দুনিয়ার ইতিহাসের গতি লক্ষ করেনি। তাদের বোঝা দরকার যে, এই সমর্থনটাই আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই বিপুল জনসমর্থনের রাজনৈতিক চেতনার মান, সাংস্কৃতিক মান ও নৈতিক মান কতটুকু? যে মানুষগুলোর সমর্থন আমরা পাচ্ছি, সেই মানুষগুলোর নিম্নগামী সংস্কৃতিগত মানের দিকে আমরা এতটুকু লক্ষ্য রেখেছি? বরং, তারা আমাদের সমর্থন করছে বলে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে আমাদের অসুবিধে হবে বলে, তাদের যেকোন কাজকেই আমরা সমর্থন করেছি।

তাই সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন প্রসঙ্গেও সেদিন আমি একটা কথা বলেছিলাম। আমি তাঁদের বলেছিলাম যে, এই যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের ভোটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা তাঁদের সরকার, তাঁদের গভর্নমেন্ট। তাঁরা চেয়েছেন, তাই হয়েছে। এই সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন দেশে হাজার একটা সমস্যা বর্তমান। গ্রামাঞ্চলে ছোট চাষীদের সাহায্য দরকার এবং গ্রামে সেচব্যবস্থার দরকার। বেকারদের কিছু কিছু ভাতা দিতে পারলে তাও দেওয়া দরকার। আমরা সরকারের গদিতে বসে মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারব না। কিন্তু, এ কাজগুলো আমরা করতে পারি। অথচ, টাকা নেই বলে এটুকুও আমরা করতে পারছি না। সেই ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা, যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা মাস গেলে যা হোক্ কিছু মাইনে পাচ্ছেন। যদিও তা দেশের জিনিসপত্রের মূল্য অনুযায়ী প্রচুর নয়, তা আমি জানি। তাঁদের অভাব আছে এবং তাঁদের আরও পাওয়া দরকার — এ কথাও সত্যি। কিন্তু, একথাও তো সত্য যে, দেশে যারা বেকার, অর্ধবেকার এবং গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত সেচব্যবস্থা না থাকায় সারা বছর চাষের কাজ থাকে না বলে চাষীদের যে শোচনীয় অবস্থা হয়ে পড়েছে, তাদের সমস্যা তাঁদের এই অল্প এবং কম মাইনে পাওয়ার চেয়েও গুরুতর সমস্যা।

তাহলে, এই সরকারটা যদি তাঁদের সরকার হয়, আর তাঁরা যদি রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন হন, জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানের অধিকারী হন, তাহলে তাঁরা নিজেরাই তো এই সরকারকে বলবেন যে, তাঁদের চেয়ে যারা কম পায়, তাঁদের চেয়ে যারা অভাবী, সরকারের যতটুকু টাকা আছে প্রথমে তাদের দেবার চেষ্টা হোক্, তারপর থাকলে তাঁরা নেবেন। আর, যদি টাকা না থাকে, তাহলে 'এই বিপুল জনসমর্থনকে সংহত করে আন্দোলন গড়ে তুলে চাপ দিয়ে ও লড়াই করে কেন্দ্র থেকে টাকা সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হোক' — এই তো তাঁরা বলবেন আশা করা গিয়েছিল।

কিন্তু, তা হল না। বামপন্থী আন্দোলনের সমর্থক সরকারি কর্মচারী হয়েও তাঁরা ঠিক উল্টোটাই ভাবলেন। তাঁরা ভাবলেন যে, যখন তাঁদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তাঁদের দাবিই আগে মিটিয়ে দেওয়া দরকার। আমি তখনই বলেছিলাম, এটা কী ধরনের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন আন্দোলন হল? সেদিন এরূপ কাণ্ড ঘটা সম্ভব হয়েছিল সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের জন্য। সরকারি কর্মচারীদের দাবি মেটাতে কত কোটি টাকা চলে গেল, অথচ জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি আমরা বামপন্থী দলগুলো করেছিলাম, তার কতটুকু আমরা পূরণ করতে পারলাম? যেই সেদিন ২৪শে এপ্রিলের এরূপ একটি জনসভায় আমি এই কথাটা বললাম, অমনি আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার সুরু হয়ে গেল যে, আমরা নাকি সরকারি কর্মচারীদের দাবি সমর্থন করি না। আমরা নাকি মনে করি যে, তাঁদের দাবিটা অন্যায়। এই কথা বলে সাধারণ সরকারি কর্মচারীদের আমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া হল।

অথচ, আমি বলতে চেয়েছিলাম, সম্পূর্ণ অন্য কথা। আমি বলতে চেয়েছিলাম, তাঁরা বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী। তাঁরা যখন একটা ন্যায্য দাবি তুলবেন, তাকে সকলেই সমর্থন করবে। কিন্তু, এই দাবি তোলার সাথে সাথে তাঁদেরও সমাজের প্রতি, জনসাধারণের প্রতি দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সমাজের প্রতি দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন না, কর্তব্য ঠিকমত পালন করবেন না — এইটাই কি যথার্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনা? এই কথাটাই আমি ভেবে দেখতে বলেছিলাম। অথচ, এগুলো যখনই বলতে গেছি, তখনই সিপিএম নেতারা বলেছেন, আমরা নাকি তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি দেখে আতঙ্কিত হয়ে এইসব কথা বলছি।

আর একটা সমস্যার কথাও আমি তখন তুলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, যে কোন বড় আদর্শের মর্মবস্তু তার সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের মধ্যে নিহিত থাকে। সংস্কৃতিগত এবং রুচিগত মান যদি উঁচু না থাকে, তাহলে যেকোনও একটি উঁচুদরের রাজনৈতিক আদর্শের ধাঁচাটা একটা প্রাণহীন দেহের মত হয়ে যায়। একটা শরীর দেখতে খুব সুন্দর হলেও যদি তার প্রাণ না থাকে, তাহলে তা যেমন অকার্যকরী, ফেলে রেখে দিলে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর; তেমনি কেউ কোন একটা বড় আদর্শের কথা বলেও যদি উন্নত রুচি এবং সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত না করে, তাহলে সেটাও ঠিক সেইরকম সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং পচনশীল। কাজেই কোন একটা পার্টি আদর্শের বড় বড় কথা বলছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। তাদের আদর্শ সত্যিই বড় কিনা তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে, তাদের নেতা, কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ ব্যক্তিগত জীবনে, প্রতিদিনের ব্যবহারে ও রাজনৈতিক আচার-আচরণে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছেন কিনা।

ফলে, সি পি এম যদি সত্যিকারের বিপ্লবী দল হয়, তাহলে তার প্রভাব বৃদ্ধির ফলে সমাজের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদের অবক্ষয় থেকে যে নিম্নগামী মান এবং নৈতিকতার অধঃপতন শুরু হয়েছে তার ওপর একটা 'রেস্ট্রেনিং এফেক্ট' (কার্যকরী বাধা সৃষ্টি) হবে। কিন্তু, তা দেখা গেল না। বরং, উল্টোটাই ঘটতে দেখা গেল। 'রেস্ট্রেনিং এফেক্ট' তো হলই না, উপরন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে যখন সিপিএম-এর প্রভাব যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল, দেখা গেল সেই সময়েই প্রথম ছাত্রদের মধ্যে গণটোকাটুকি শুরু হয়েছে। তাদের দলে যে যুবসম্প্রদায় আসছে, তারা যখন স্লোগান দিচ্ছে তাদের কোমর দুলছে। যারাই তাদের কোনরূপ সমালোচনা করতে গেছে, তাদের প্রতি তাদের বেশিরভাগ কর্মীর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে রুচিগত ও সংস্কৃতিগত মান প্রকাশ পেয়েছে তা অত্যন্ত নিম্নস্তরের। তারা যুক্তিতর্কের মধ্যেই আসতে চায়নি, মানুষ বলেই কাউকে গ্রাহ্য করেনি। কেউ বিরোধিতা করলেই তাকে হয় মেরেছে, আর না হয় নানাভাবে 'হিউমিলিয়েট' (অপমান) করেছে। তাহলে, এই আচরণের সঙ্গে ফ্যাসিস্টদের, উগ্র 'ফ্যানাটিক' (অন্ধ সমর্থক)দের, যারা যুক্তিহীন অন্ধ মানসিকতা সমাজে গড়ে তুলতে চায়, তাদের সঙ্গে এইসব তথাকথিত বিপ্লবীদের আচরণে পার্থক্য কোথায়?

তাই আমি তখন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলাম, জনসাধারণকে খেপালেই বিপ্লব হয় না। বিপ্লব সেই জনসাধারণই করতে পারে, যারা বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষিত হয়ে খানিকটা অর্থে বিপ্লবের উপযোগী মানসিকতা এবং সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে। যেকোন উপায়ে মানুষকে উত্তেজিত করলেই তার দ্বারা বিপ্লব হয় না, বিপ্লবের নামে প্রতিক্রিয়ার জমি তৈরি হয়। ভারতের মাটিতে বারবার ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছে। ফলে, এই মারাত্মক ভুল রাজনীতি ও কার্যকলাপের জন্য সমাজমানসে যে যুক্তিহীন মানসিকতা বিরাজ করছে, তারই সুযোগে আজ কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়ার প্রবল অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অতীতের ভুল-ত্রুটি যাই হয়ে থাকুক না কেন, তাকে সংশোধন করে আবার আপনাদের সংগঠিত হতে হবে। অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া নিয়ে প্রতিদিনের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবার আপনাদের ধীরে ধীরে সংহত হতে হবে। এ যেমন সত্য কথা, তেমনি এর সাথে সাথে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। তা হচ্ছে, এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে যদি আপনারা সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চান, অর্থাৎ জনগণের মুক্তির অর্থে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতে চান, তাহলে এই সংঘবদ্ধ আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অত্যন্ত জরুরি প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলে চলবে না। ...''

সকল কমরেডের কাছেই শিক্ষণীয় এক দৃষ্টান্ত

প্রভাস ঘোষ

আমরা সকলেই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত আছি। আমরা জানি এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা কত কঠিন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, এমনকী ব্যক্তিগত জীবনে ভাললাগা-মন্দলাগা, সুখ-দুঃখ, স্নেহ-মমতা, প্রতিটি প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রদর্শিত পথে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতি মুহূর্তে কে কতটা যোগ্যতার সাথে এই সংগ্রাম করছি, তার উপরই নির্ভর করে কে কতটা বিপ্লবী চরিত্রের মান অর্জন করতে পারব। আমরা জানি, নিয়ত চলমান শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে বিরাজ করে সদা সচেতন ও সতর্ক থেকে এই সংগ্রাম সঠিকভাবে চালাতে না পারলে এক সময়ের অর্জিত অপেক্ষাকৃত উন্নত মানও পরবর্তী সময়ে রক্ষা করা যায় না। তাই এই সংগ্রাম আমৃত্যু চালিয়ে যেতে হয়। কোনও প্রশ্নে কোনও মুহূর্তে আত্মসন্তুষ্টি বা বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ঘটলে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যায়। আবার, কমরেড ঘোষের শিক্ষা থেকে আমরা জানি, অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম করতে হয় সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রগুলিতে — যেখানে বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানের প্রশ্ন যুক্ত। এইসব ক্ষেত্রেও জীবনের ও চরিত্রের আমূল পরিবর্তনের বিষয় জড়িত। এই সংগ্রামে আমরা কেউ কোনও প্রশ্নে এগিয়ে, কোনও প্রশ্নে পিছিয়ে। আবার, একটা সময় কেউ কোনও প্রশ্নে এগিয়ে থাকলেও পরে পিছিয়ে যাই। সংখ্যায় অতি কম হলেও কেউ কেউ বহু প্রশ্নেই এগিয়ে থাকে। সঠিক পদ্ধতিতে আমরা কতটা সংগ্রাম চালাতে পারি, তার দ্বারাই সবকিছু নির্ধারিত হয়। কমরেড ঘোষ বলতেন, এই সংগ্রামে সিনিয়রদের থেকে জুনিয়ররা যেমন শিখবে, আবার জুনিয়রদের থেকেও সিনিয়রদের শেখার আছে, এবং কারও কারও কাছ থেকে অনেক বেশিই শেখার আছে। যিনি যথার্থই বড়, তিনিই একমাত্র ছোটদের কাছ থেকে শিখতে পারেন। সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বানে এখন দলের অভ্যন্তরে 'রিভাইটালাইজেশন ও কনসোলিডেশনের' সংগ্রাম চলছে, যার সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে নেতা ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় মান উন্নয়নের প্রশ্ন। এই সময় একজন সাধারণ সংগঠকের কিছু অসাধারণ সংগ্রাম আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

আপনারা জানেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ ২৮ জন পার্টির সংগঠক ও কর্মী সি পি এমের ষড়যন্ত্রে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে আলিপুর জেলে আছেন। এঁরা প্রায় সকলেই যেমন বাইরে থাকাকালীন পার্টির শিক্ষানুযায়ী উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছেন, এখন কারান্তরালেও ২৪শে এপ্রিল পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস, ৫ই আগষ্ট মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস, ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস এবং বিভিন্ন মনীষী ও বিপ্লবীদের স্মরণ দিবস সকলকে সমবেত করে উদ্‌যাপন করে থাকেন। নিয়মিত গ্রুপ রিডিং, স্টাডি ক্লাসও করেন। এই গ্রুপ রিডিং ও স্টাডি ক্লাসে দলের বাইরের লোকজনও থাকেন। এভাবেই জেলের মধ্যেও বৈপ্লবিক কর্মধারা অব্যাহত রাখার এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত এঁরা স্থাপন করেছেন। এই কমরেডদেরই একজন হচ্ছেন অনিরুদ্ধ হালদার, যাঁকে রাজ্যের বহু কমরেডই চেনেন না। এই কমরেড সম্পর্কেই কিছু কথা বলব।

কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার কুলতলি কেন্দ্রের চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পার্টি সমর্থক পরিবারের সন্তান। অতি অল্প বয়সে স্কুল জীবনে পার্টির সাথে যুক্ত হন এবং ডিএসও-র কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। সেই সময়ে তাঁর কাকা ওই এলাকায় পার্টির দায়িত্বে ছিলেন, পরে তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। এতে এলাকায় দলের কাজ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা কমরেড অনিরুদ্ধকে ব্যথা দেয় এবং ওই অল্প বয়সেই এলাকায় পার্টির কাজ শুরু করেন। দলের কাজ করতে করতে তিনি ধীরে ধীরে পার্টির দায়িত্বশীল সংগঠক হিসাবে গড়ে উঠতে থাকেন, নিজের ভাইদেরও পার্টির কর্মী হিসাবে তৈরি করতে থাকেন। অল্প বয়সেই তিনি কমরেড ঘোষের মূল্যবান ভাষণ সম্বলিত পুস্তকগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন এবং নিজেকে একজন ভাল কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রাম চালাতেন। কিছুদিনের মধ্যেই গভীর দরদী মন, দলের প্রতি আনুগত্য, শৃঙ্খলাবোধ, নিষ্ঠা, বিবেচনাবোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষিপ্রগতি, একরকম চব্বিশ ঘণ্টাই দলের কাজে নিযুক্ত থাকা, দায়িত্ব দেওয়া হোক না হোক দলের যেকোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া, প্রচন্ড সংকটেও শান্তভাব বজায় রেখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার সাহসিকতা, ছোট বড় সকলকে নিয়ে চলার মানসিকতা, ভদ্র ও নম্র আচরণ ইত্যাদি গুণের ফলে চুপড়িঝাড়া, নলগড়া, কঙ্কনদীঘি, ভুবনেশ্বরী, মৈপীঠ, মনিরতট, বাইশহাটা, জালাবেড়ে প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় তিনি পার্টির কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের গভীর ভালবাসা ও আস্থা অর্জন করেন। শহীদ কমরেড আমির আলি হালদার, প্রয়াত কমরেড রেণুপদ হালদার, কমরেড ইয়াকুব পৈলান সহ সকল নেতাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন ও আস্থার চোখে দেখতেন এবং অনেক গুরু দায়িত্ব দিতেন। তাঁর আরেকটি বিরল গুণ ছিল — কখনও কোন সময় তাঁর সিনিয়র বা নেতৃস্থানীয় কোনও কমরেডের দোষ-ত্রুটি দেখা দেওয়ার জন্য সেই কমরেডটির পাবলিক ইমেজ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় দলের কাজ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে, যত্রতত্র ফিসফাস না করে সেই সিনিয়রের অধীনে থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে নিজের দায়িত্ব পালন করে সেই ক্ষতিকে পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন এবং ছোট হিসাবে বিনম্রভাবে সেই সিনিয়রের ত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন।

কাজকর্মের প্রয়োজনে পুলিশের ওয়ারেন্ট এড়িয়ে চলতে, সিপিএম ক্রিমিনালদের খুন করার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে কমরেড অনিরুদ্ধকে প্রায় সময়েই ঘরের বাইরে থাকতে হয়েছে। কখনও কখনও হয়ত পুলিশ ও সিপিএম-এর মার্ডার স্কোয়াডের চোখ এড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঝটিকা বেগে বাড়ি ঘুরে গেছেন, এই পর্যন্ত। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাই, স্ত্রী, ছোট একটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে। স্ত্রী মানসিক ব্যধিগ্রস্ত, কখনও কিছুটা স্বাভাবিক, অনেক সময়ই অস্বাভাবিক থাকতেন। গ্রাম্য বৃদ্ধ বাবা-মা এই রোগ বুঝতে পারতেন না, প্রায়ই কাজকর্ম নিয়ে ঘরের বৌ-এর সাথে অশান্তি হত। এই অবস্থায় স্ত্রী আলাদা থাকতে চেয়েছেন, কিন্তু অনিরুদ্ধ রাজি হননি। এমনিতে আর পাঁচজন মেয়ের মত স্বামীর সাথে ঘর করতে না পারায় স্ত্রীর চাপা অভিমান ছিল, স্বামী আলাদা হতে রাজি না হওয়ায় এই অভিমান আরও বেড়ে যায়। অনিরুদ্ধ তখন বাইরে, এই অবস্থায় খবর পান, স্ত্রী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। দলের কাজ করতে করতেই সাধ্যমত খোঁজখবর নিয়েও স্ত্রীর কোন সন্ধান পান না। ইতিমধ্যে সিপিএম এই সুযোগে তাঁর শ্বশুরবাড়িকে বিভ্রান্ত করে অনিরুদ্ধকে বধূ হত্যায় ফাঁসাবার ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু স্থানীয় জনগণের তীব্র সমালোচনায় তারা পিছু হটে যায়। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা, ছোট ছেলে-মেয়ে — দেখার তেমন কেউ নেই, অথচ স্ত্রী'র সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, এসব সমস্যায় ওঁকে কখনও ব্যতিব্যস্ত ও বিব্রত দেখা যায়নি। নেতাদের কাছেও এসব নিয়ে কখনও ছুটে যাননি, একমনে যথারীতি আগের মত কাজ করে গেছেন। আমার সাথেও কয়েকবার দেখা হয়েছে, আমাকেও কিছু বলেননি। পরে আমি একদিন কলকাতার অফিসে অনিরুদ্ধকে দেখে হঠাৎ আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীর নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা প্রথম জানতে পারলাম। এলাকার একজন সমর্থক জানিয়েছেন, কলকাতায় বড়বাজারে ফুটপাথে দূর থেকে ওর স্ত্রীকে দেখেছেন, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে আর খুঁজে পাননি, জনারণ্যে হারিয়ে গেছেন। বড়বাজারে স্ত্রী'র খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন, এটা জানিয়ে এলাকার কিছু সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করে অনিরুদ্ধ ফিরে যান। আরও বেশ কয়েক মাস বাদে জানলাম, স্ত্রীকে বিচিত্রভাবে পাওয়া গেছে। কলকাতার এক বাড়ি থেকে অনিরুদ্ধকে জানিয়েছে, তাদের বাড়িতে ওর স্ত্রী কাজ করছেন। বিস্মৃত হওয়ায় এতদিন ঠিকানা বলতে পারেননি, এখন মনে পড়ায় বলতে পেরেছেন। অনিরুদ্ধ এসে স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ি নিয়ে যান। স্ত্রী কিছুদিন থেকে বাপের বাড়ি চলে যান, ফিরে আসেন, আবার চলে যান। এভাবে কিছুদিন চলার পর পুনরায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান, এটাও আমি সম্প্রতি জেনেছি। সেই সময়ে কমরেড অনিরুদ্ধ আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে কাজ করছেন। তারপর হাইকোর্টের রায়ে সাজা হওয়ার পর জেলে চলে যান, বাড়িতে তখন তাঁর ভাইও ছিল না, তাকেও পুলিশ খুঁজছিল, পরে সেও ধরা পড়ে। সম্প্রতি অনিরুদ্ধর একমাত্র মেয়েটি সুইসাইড করে মারা গেছে, কারণ অজানা। হয়ত সে বাড়ির এই অবস্থায় মানসিক চাপে ভুগছিল। হয়ত মা নিরুদ্দেশ, বাবা যাবজ্জীবন জেলে, এ নিয়ে মনোকষ্টে ছিল, নিজেকে সামলাতে পারেনি। জানলাম, আলিপুর জেলে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ও কমরেড প্রফুল্ল মন্ডল যখন অশ্রুসজল কণ্ঠে কমরেড অনিরুদ্ধকে এই সংবাদ দেন, তখন তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন, তারপর বলেন, 'পার্টি তো বলেছে, দেশে হতাশা যেমন বাড়ছে, আত্মহত্যাও বাড়ছে'। এরপর চুপড়িঝাড়ার সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। পরে ৬ ঘন্টার প্যারোলে ওঁকে বাড়িতে আনা হয়। তিনি যখন পৌঁছান, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। রাস্তার দু'ধারে শত শত মানুষ তাঁকে দেখার জন্য ভীড় করে, যেখানে শবদাহ করা হবে, সেখানে পৌঁছালে দেখা যায় সেখানেও কয়েক হাজার মানুষ অপেক্ষমান। একদিকে মেয়ের মৃতদেহ দাহ হচ্ছে, অন্যদিকে কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার সমবেত শোকার্ত জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা, কিভাবে বিপ্লবীরা শোককে দেখে। প্রায় আধঘন্টার এই বক্তৃতায় তিনি আহ্বান জানান, দলের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে তাঁরা যেন গণআন্দোলনগুলি গড়ে তোলেন ও চালিয়ে যান, দলকে যেন আরও শক্তিশালী করেন। তিনি দলের মুখপত্র গণদাবী'র গ্রাহক হওয়ারও আবেদন জানান। কলকাতায় আমি তখন ঘুমন্ত। তিনি যে প্যারোলে ছাড়া পেয়েছেন, আমি জানতাম না। হঠাৎ রাত প্রায় ১টায় কমরেড বিধান চ্যাটার্জী ওখান থেকে ফোন করে জানান, অনিরুদ্ধ আমার সাথে কথা বলতে চান। বহুদিন বাদে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে জানান, ওঁরা জেলে ভাল আছেন, এখানে এসে লোকজনদের সাথে দলের কাজকর্ম নিয়ে কি কি বলেছেন, সেটাও জানান। আমরা কে কেমন আছি তারও খোঁজ নেন, বিশেষভাবে খোঁজ নেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর স্বাস্থ্যের সর্বশেষ সংবাদ। মেয়ের মৃত্যু নিয়ে কিছু বলেননি, আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি যেমন নীরব থেকেছেন, আমিও নীরবেই থাকতে দিলাম। শুধু ফোনে কয়েকজনের কান্নার শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, কারা কাঁদছে? উত্তরে অনিরুদ্ধ জানালেন, 'আমার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, স্থানীয় লোকজন কাঁদছে। আমি ওদের কিছু বুঝিয়েছি, যাবার আগে আবার বুঝিয়ে যাব'। শুধু এইটুকু, আর কিছু বলেননি। এই মৃত্যুতে দুঃখ পাওয়াই স্বাভাবিক। গভীর দুঃখই অনিরুদ্ধ পেয়েছেন, কিন্তু সবকিছুই কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে নীরবেই সামলেছেন। কোন হা-হুতাশ নেই, তাঁর অবর্তমানে পরিবার-সন্তান দেখা না-দেখা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই, কোন অনুযোগও নেই। অন্যদের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। যাঁরা দেখেছেন, যাঁরা শুনেছেন, সকলেই বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত। শুনলাম, তাঁর সঙ্গী একজন পুলিশ কর্মচারীর বিস্মিত মন্তব্য — 'এমন মানুষেরও জেল হয়'। পরদিন খুব ভোরে জয়নগর পার্টি অফিস থেকে কমরেড অনিরুদ্ধ'র আবার ফোন পেলাম, 'কমরেড আমি জেলে ফিরে যাচ্ছি, আমাদের নিয়ে ভাববেন না, আমরা জেলে বসে বাইরের আন্দোলনের খবর পাচ্ছি, আরও বইপত্র পাঠাবেন, এলাকার সংগঠন আরও ভাল করে দেখতে বলবেন'। লক্ষণীয়, তিনি কিন্তু শোকগ্রস্ত পরিবার, দিদিহারা অসহায় পুত্র এদের সম্পর্কে কিছুই বলেননি। পরে জেলে ফিরে গিয়ে আমাকে এক চিঠিতে জেলার কিছু সাংগঠনিক সমস্যা জানিয়েছেন, নিহত-আহত ও বন্দী কমরেডদের পরিবারের লোকজনদের খোঁজখবর যেন জেলার নেতা ও কর্মীরা আরও ভাল করে রাখেন,এই ব্যাপারেও অনুরোধ করেছেন।

আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বহু নেতা-কর্মীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি, কমরেড ঘোষের ছাত্র হিসাবে অনেক নেতা ও কর্মীর জীবন সংগ্রাম থেকে বেশ কিছু অনুসরণীয় মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছি, অন্য নেতা ও কর্মীরাও নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বন্দী এই কমরেডের জীবন সংগ্রামের কিছু অধ্যায় আপনাদের বিবেকের কাছে উপস্থিত করলাম। আশা করি, প্রত্যেক নেতা ও কর্মী আত্মবিচার করে দেখবেন, ভেবে দেখবেন, এই কমরেডের সংগ্রাম থেকে কী নেওয়ার আছে।

মেদিনীপুরের বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপর্যস্ত

তিনের পাতার পর

বহু খালের সংস্কার হওয়া দরকার। এই সংস্কারের কাজ প্রসারিত করতে হবে হলদি নদী পর্যন্ত, যাতে জল সরাসরি সমুদ্রে যেতে পারে।

এবারও বিপর্যয় দেখা দেওয়ার পর এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান ১৩ জুলাই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্তের সাথে দেখা করে উদ্ধার ও ত্রাণের দাবি করেন। জেলায় গণসংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবিতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলি নিয়ে বেলদা ব্লক ও সবং ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করে যে প্রতিশ্রুতিই দিন, গণআন্দোলন ছাড়া ঐ প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করানো যাবে না।

কলকাতা

‘যৌনশিক্ষা ইভটিজিং বাড়াবে’

‘যৌনশিক্ষা ইভটিজিং বাড়াবে। রাস্তায় নারীরা নিরাপদে চলতে পারবেন না’ — গত ২১ জুলাই সেন্ট পলস স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের এক কনভেনশনে একথা বলেন শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। তিনি বলেন, যৌনশিক্ষা চালু করলে ছাত্রছাত্রীদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। যাঁরা এবিষয়ে সরকারি ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন, সেই শিক্ষকরাও ক্লাস নিতে চাইছেন না, এ জিনিস পড়ানো যায় না। কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ বিজ্ঞান বেরা বলেন, যৌনশিক্ষা বহু মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করবে। যে বয়সে যে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় সেই বয়সে সেটা দিলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এদেশে ম্যালেরিয়া, ডায়ারিয়ায় সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়। অথচ এ ব্যাপারে সরকার যে টাকা দিচ্ছে, এডস্-এ আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কম হলেও সেখানে টাকা বরাদ্দ হচ্ছে বহুগুণ বেশি। মানুষকে রোগমুক্ত রাখা কি এর উদ্দেশ্য, নাকি এর কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য আছে? কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা অংশুমান রায়। তিনি জোরের সাথে বলেন, অমানুষ তৈরির এই শিক্ষা ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না। কনভেনশনের মুখ্য বক্তা প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ মিত্র বলেন, যৌনশিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মহৎই হবে, তাহলে কী বই পড়ানো হচ্ছে সেটা অভিভাবকদের জানতে দেওয়া হবে না কেন? ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা তুলে দিয়ে কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে ধ্বংস করা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে যৌনশিক্ষা এবং ৮টি পর্বে পরীক্ষা-পদ্ধতি ও গ্রেডেশন প্রথা মাধ্যমিক শিক্ষাকে ধ্বংস করবে। তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানান। কনভেনশনে আগত প্রত্যেকেই এই ভয়াবহ শিক্ষানীতি সম্পর্কে শঙ্কিত হন। শিক্ষাকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। কনভেনশন থেকে গ্রন্থাগারিক হীরালাল মান্নাকে সভাপতি এবং সুজিত পাত্র ও বরুণ বিশ্বাসকে যুগ্ম সম্পাদক করে কলেজ স্ট্রীট-মানিকতলা ‘সেভ এডুকেশন কমিটি’ গঠিত হয়।

এদিনের কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন ছাত্র পীযূষকান্তি ভট্টাচার্য। কনভেনশন সঞ্চালন করেন হীরালাল মান্না।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

স্কুলস্তরে যৌন শিক্ষা ও গ্রেডেশন চালুর তীব্র প্রতিবাদ

স্কুলস্তরে ‘জীবনশৈলী’র নামে যৌনশিক্ষা ও গ্রেডেশন প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে গত ১৪ জুলাই দঃ ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর শিবনাথ শাস্ত্রী হলে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন শিক্ষিকা প্রীতিকণা কর সভানেত্রী হিসাবে এস ও’র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড কমল সাঁই এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি কমরেড প্রদীপ হালদার। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বনাশা পরিস্থিতি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। সব শেষে অল

কনভেনশন পরিচালনা করেন। বক্তা ছিলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক, শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কমরেড তপন রায়চৌধুরী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, অল ইন্ডিয়া ডি ইন্ডিয়া ডি এস ও’র জেলা সম্পাদক কমরেড বিশ্বনাথ সরকার জয়নগর থানার প্রতিটি অঞ্চলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়ে কমিটি গঠন করে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানান।

মুর্শিদাবাদ

নিকাশিনালা সংস্কার সহ ৫ দফা দাবি জানালেন বহরমপুরের নাগরিকরা

গত ১৯ থেকে ২২ জুলাই ভারী বর্ষণে বহরমপুর পৌরসভার অধিকাংশ ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে যায়। নাগরিকরা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। এস ইউ সি আই বহরমপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে পৌরসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে চারজনের এক প্রতিনিধি দল চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি জানান, তাঁর দায়িত্বের কাজ তিনি করবেন, কিন্তু সেচদপ্তর এবং জেলা পরিষদ তাদের দায়িত্ব পালন না করলে সমস্যার সমাধান হবে না। আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ প্রসঙ্গে আলোচনায় চেয়ারম্যান জানান, তাঁরা পৌরসভার পক্ষ থেকে জলকর আদায় করবেন। এস ইউ সি আই প্রতিনিধিরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। নিকাশিনালা সংস্কার সহ পাঁচ দফা দাবি নিয়ে এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেডস পুলক বাগচী, কৌশিক চ্যাটার্জী, গৌতম সাহা ও রত্না বাগচী। অনুরূপে একটি স্মারকলিপি মহকুমা-শাসকের হাতে তুলে দেন এস ইউ সি আই বহরমপুর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড মানোয়ার হোসেন। লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অপূর্ব ব্যানার্জী জানান, ভবিষ্যতে জলকর এবং ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

২৩ জুলাই অপর এক ডেপুটেশনে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিশিষ্ট নাগরিকরা পৌরসভা, সেচ দফতর, জেলাশাসক এবং জেলা পরিষদে সাক্ষাৎ করে কর্তৃপক্ষদের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করেন। ডেপুটেশনে ১৪ নং ওয়ার্ড নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শৈলেন চক্রবর্তী, শৈলেশ ঘোষ, খাদিজা বানু, সাধন সরকার প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

বর্ধমান

তাপসী মালিকের খুনিদের আড়াল করার বিরুদ্ধে মহিলাদের বিক্ষোভ

তাপসী মালিকের ধর্ষণকারী ও খুনিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, দলীয় চাপে সিবিআই তদন্ত বন্ধ না হওয়া, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনকারী কৃষকদের ওপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি দাবিতে ২৪ জুলাই অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

মহিলাদের একটি মিছিল কোর্ট পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে যায়। বহু সাধারণ মানুষও সেখানে সমবেত হন। এরপর সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড সুমিত্রা পুরকাইতের নেতৃত্বে জেলা সম্পাদিকা কমরেড কল্পনা ব্যানার্জী, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বুলু চ্যাটার্জী, তমশ্রী চ্যাটার্জী, ঊষা আচার্য ও সুমনা কুণ্ডু এডিএমের নিকট ডেপুটেশন দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শ্যামলী মুখার্জী বলেন, তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করার পর রাজ্য- জুড়ে প্রবল গণবিক্ষোভের চাপে সরকার সিবিআই তদন্তে রাজি হয়। কিন্তু তদন্তে যখন এক এক করে সিপিএম নেতাদের নাম এই বর্বরোচিত ঘটনায় জড়িত বলে প্রকাশিত হতে থাকে। তখন সিবিআইকে তারা চক্রান্তকারী হিসাবে চিহ্নিত করতে থাকে, অতীতে বহু তদন্ত চাপের মুখে বন্ধ হয়ে যাওয়ার নজির থাকায় আমরা চাই, এই তদন্ত যেন ধামাচাপা না পড়ে। তিনি ছাড়াও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড ঊষা আচার্য ও বেলা পাল।

হাওড়া

ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্র-যুব-মহিলাদের বিক্ষোভ

গত ১৭ জুলাই হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বল্লভবাটি প্রাথমিক স্কুলের এক প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীকে ঐ স্কুলের শিক্ষক বাসুদেব খোটেল স্কুলের মধ্যে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় রাজ্যের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্তম্ভিত ও লজ্জিত। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও এই ধরনের ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলেছে। রাজ্য সরকার ঢালাও মদের লাইসেন্স দিয়ে, অনলাইন লটারির জুয়া চালু করে, অবাধে ব্লু ফিল্মের ব্যবসা চালাতে দিয়ে একদল মানুষকে রুচি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ বিবর্জিত পশুতে পরিণত করছে। এরই পরিণতিতে এই ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটছে।

অভিযুক্ত শিক্ষক সিপিএম দলের লোকাল কমিটির সম্পাদক ও জোনাল কমিটির সদস্য। সংবাদে প্রকাশ, অভিযুক্ত শিক্ষক সিপিএম দলের নেতা হওয়ায় জগৎবল্লভপুর থানা প্রথমে ডায়েরি নিতে অস্বীকার করলেও জনমতের চাপে তা নিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ জুলাই এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ডি ওয়াই ও’র জেলা সম্পাদক কমরেড নিখিল বেরা এবং বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড পুতুল চৌধুরী। পরে ডি এস ও’র জেলা সম্পাদক কমরেড শুকদেব বারিকের নেতৃত্বে জেলাশাসকের কাছে এবং ডি এস ও’র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তাপস বেরার নেতৃত্বে পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ইউকো ব্যাঙ্কের হেড অফিসে কর্মচারীদের বিক্ষোভ

পার্টটাইম কর্মচারীদের ফুলটাইম করা, কর্মী নিয়োগ, সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মীদের জন্য পেনশন ইত্যাদি দাবিতে এবং আউটসোর্সিং ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে ইউকো ব্যাঙ্কের হেড অফিসের সামনে গত ১২ জুলাই ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ফোরামের ইউকো ব্যাঙ্ক ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক আলোকতীর্থ মণ্ডল, সভাপতি অরূপরতন সাহা এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভাস্কর সান্যাল।

মুর্শিদাবাদ

বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনের শহীদ নহিরুদ্দিন স্মরণে সভা

১৭ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম শহীদ নহিরুদ্দিন স্মরণে শহীদ দিবস পালিত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে পদ্মা-ভাগীরথী-ভৈরবের ভাঙনে মুর্শিদাবাদ জেলার ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭৯ বর্গকিলোমিটার জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, বাস্তুচ্যুত হয় ৭৮ হাজার মানুষ। বিগত ২০০৪-০৫ সালে জলঙ্গীর টলটলি পরাশপুর দয়ারামপুরে বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। ইতিপূর্বে জলঙ্গী বাজার, আখেরীগঞ্জের জনবহুল জনপদ নদীভাঙনে বিলীন হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার মানুষ বাস্তুহারা। এমনকী সরকারী ব্যর্থতায় তাদের নির্বাসনে ঠাঁই হয়েছে। নারী এবং শিশু পাচারের অন্যতম কারণ হিসাবে এ জেলার ভাঙন ভয়াবহ বিপদের চিহ্ন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বছর বছর বন্যার সময় কোটি কোটি টাকার বোল্ডার ফেলে সরকারি অর্থ অপব্যয় করার প্রতিবাদে ২০০০ সালে ১৭ জুলাই প্রতিরোধ আন্দোলনে পুলিশ ও ই এফ আর-এর গুলিতে খেতমজুর নহিরুদ্দিন শহীদ হন। বিজ্ঞানসম্মত মাস্টারপ্ল্যানের ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে সেই আন্দোলন আজও অব্যাহত। এবারেও দশটি ব্লকে পথসভা, দাবি ব্যাজ পরিধান, শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে দিনটি স্মরণ করা হয়। আখেরীগঞ্জ পদ্মাপাড়ে খড়িবোনায় পাঁচ শতাধিক সাধারণ মানুষের জমায়েত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুল গফুর সরকার। যুগ্মসম্পাদক সাধন রায় ও স্থানীয় নেতা আবুল কালাম আজাদ সভায় বক্তব্য রাখেন।

বহরমপুরের সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী। স্থানীয় টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে স্মরণ দিবসে বক্তব্য রাখেন, যুগ্ম সম্পাদিকা খাদিজা বানু, শ্রমিক নেতা চাঁদগোপাল ধর, শিক্ষক নেতা কমল কান্তি ঘোষ প্রমুখ। জঙ্গীপুর, রাণীনগর, বেলডাঙা, লোচনপুর, লালবাগ, ইসলামপুর, সুতি এবং কান্দী থানায় যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে শহীদ স্মরণ দিবস পালিত হয়। জঙ্গীপুরে মির্জা নাসিরুদ্দিন, কান্দীতে উত্তম মণ্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বামশক্তিগুলির প্রতি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের ঐক্যের আহ্বান

(বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ওদেশে বামপন্থী দলগুলির ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) যে আহ্বান রেখেছে, 'ভ্যানগার্ড' জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত সেই বক্তব্যটি এখানে প্রকাশ করা হল।

— সম্পাদক, গণদাবী)

দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার, দুঃশাসনমুক্ত করার আওয়াজ উঠেছে। গত ৩৬ বছরের বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা থেকেই এ দাবির যৌক্তিকতা বেরিয়ে এসেছে। এখানেও দু'টি ধারা প্রবহমান রয়েছে। এক, বুর্জোয়া দলগুলোকেই সংস্কার-মেরামত করে নতুনভাবে নতুন চেহারায় হাজির করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, জনগণের সত্যিকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তিকে সামনে নিয়ে আসা। একথা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর শোষণের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রাখতে গিয়ে নির্বাচিত-অনির্বাচিত, সামরিক-অসামরিক যত পোষাকেই বুর্জোয়াশ্রেণীর দলগুলি শাসনকার্য পরিচালনা করেছে, তারা রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত, দুর্নীতিগ্রস্ত করেই তা করেছে। সন্ত্রাস, তোলাবাজি, নমিনেশন-বাণিজ্য, ঘুষ-কমিশন, দেশে অবৈধ দখল, বিদেশে সম্পদ পাচার, গণতন্ত্রীকরণের বদলে প্রশাসন-প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ, জাতীয় স্বার্থের জলাঞ্জলি সহ আদর্শহীনতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে এ দলগুলি। স্বৈরাচার আর রাজাকারের দুই খুঁটির উপর ভর করে দ্বি-দলীয় মাধ্যমে এরা দেশকে, দেশের রাজনীতিকে এমন জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল যার ভোগান্তি এখন সমগ্র জাতিকে পোহাতে হচ্ছে। অন্যদিকে বাম-প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতির অভিযোগ নেই। বামপন্থার রাজনীতিতে বিষয়, সময় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি-সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি থাকলেও এদের দেশপ্রেম, ত্যাগ, নিষ্ঠা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। জনগণের অধিকারকে সামনে রেখে এদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে বামপন্থী শক্তির ভূমিকা সর্বদাই থেকেছে অগ্রগণ্য এবং এদের সীমাহীন আত্মত্যাগ অনস্বীকার্য। বুর্জোয়া দলগুলি যখন রাজনীতির মাহাত্ম্যকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে, তখন আমাদের দল সহ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল, জাতীয় গণফ্রন্ট, কমিউনিস্ট ইউনিয়ন, ৫ দল ও গণমুক্তিভুক্ত সংগঠনসমূহই রাজনীতির আদর্শবাদী ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখেছে। এসব দলের বহু নেতা-কর্মীর নাম করা যায় যাঁরা ৩০, ৪০, ৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে দুর্নীতিমুক্ত থেকে আজও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে জনগণের জীবন ও সংগ্রামের সাথে একাত্ম থাকছেন।

এতদিনের কালোটাকা-নির্ভর বুর্জোয়া দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির দাপট ও প্রকোপের পাশাপাশি বামপন্থী রাজনীতির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, বুর্জোয়া দলসমূহের উপর নির্ভরতা ও নিজেদের দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের ঘাটতি বাম ধারাকে দুর্বল করে রেখেছে। আজ দেশের এই ক্রান্তিকালে জনদুর্ভোগ লাঘব ও সংকট মোচনে সর্বনিম্ন এক-দুটি ইস্যুতে হলেও বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে শোষিত শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে আশা জাগাতে পারে। এটা সময়ের দাবি।

এখন গণতন্ত্র ও সংস্কার নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ও বহুমুখী বিচিত্র কর্মধারা চালু রয়েছে। বিশেষ করে বুর্জোয়া দলগুলিতে ফ্যাশন ডেমোক্রেসি সাজানোর কাজ চলছে। এতে এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার বনাম বহু ব্যক্তির কোন্দল যেমন প্রকাশিত হচ্ছে, তেমনি এদের গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের ঘাটতিও ফুটে উঠছে। গণতন্ত্র শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর জন্য একাকার হয়ে যেতে পারে না। তারপরও বুর্জোয়া অর্থেও গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং শাসন-প্রশাসন কি বুর্জোয়াশ্রেণীর দলগুলির পক্ষে আজ দাঁড় করানো সম্ভব? গণতন্ত্রের বাহ্যিক খোলস ও ঠাটবাট বজায় রেখেই কি উন্নত কি অনুন্নত সকল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেই আজ গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ও স্বৈরাচারী প্রবণতা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। একটা গণতান্ত্রিক শক্তি বলতে আমরা কী বুঝি? জনগণের দাবি এবং অধিকারের পক্ষে যারা দাঁড়ায় না, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে যারা শরিক হয় না, তারা গণতান্ত্রিক শক্তি হতে পারে না। শ্রমিকদের মনুষ্যোচিত মজুরি, তাদের প্রতি মালিকশ্রেণীর যথেচ্ছাচার বন্ধ, সবার জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস, তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর-কয়লা ইত্যাদি সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী থাবার হাত থেকে রক্ষা সহ জনজীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে লড়াই করতে, কিংবা ক্ষমতায় গিয়ে এসবের প্রতিকার করতে বুর্জোয়া দলগুলিকে দেখা যায়নি। এরা ক্ষমতার বাইরে থাকলে জনজীবনের মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে গৌণ বিষয় হাজির করে ক্ষমতা-দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতে গিয়ে আন্দোলন-আন্দোলন খেলা করেছে। কারণে-অকারণে বিভিন্ন কর্মসূচি সময়ে-অসময়ে হাজির করে একদিকে জনজীবনে দুর্ভোগ তৈরি করেছে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ারগুলোকে অকার্যকর করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বামপন্থীরাই যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তি, তার প্রমাণ তারা রেখেছে সর্বদাই শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগণের পক্ষে এবং জাতীয় স্বার্থে লড়াই করে। দেশের গ্যাস-কয়লা সম্পদ, বন্দর ইত্যাদি ইস্যুতে তারাই জাতীয় স্বার্থে দাঁড়িয়েছে। সবকিছু ঠেকাতে না পারলেও যতটুকু জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত থেকেছে, তা এদের আন্দোলনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক সহ মেহনতি মানুষের পক্ষে এরাই ছিল দাবিতে সোচ্চার। দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন এবং লুটতরাজের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন থেকে বামপন্থী শক্তিই বলে এসেছে এবং গণচেতনার মানকেও একটা স্তরে তুলে এনেছে, যার কারণে সরকারের দুর্নীতিবিরোধী বক্তব্য শুরুতে এতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

গণতান্ত্রিক শক্তির আরেকটি পরিচয়, এরা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং আগ্রাসন বিরোধী। কিন্তু আমাদের দেশের বুর্জোয়া শক্তি কখনোই সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অবস্থান নেয়নি। বরং তারা সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নতজানু থাকার ব্যাপারে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ইরাক, আফগানিস্তান দখল এবং গণহত্যা; প্যালেস্টাইনে মার্কিন দোসর ইজরাইলিদের নৃশংসতা; কিউবা, উত্তর কোরিয়া, ইরান, সিরিয়া সহ দুনিয়ার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি তৎপরতার বিরুদ্ধে বামপন্থী শক্তিই সোচ্চার থেকেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ, এডিবি ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতার বিরুদ্ধেও বামপন্থীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

মুষ্টিমেয় ধনিকগোষ্ঠীর সম্পদ-বৃদ্ধির নিরিখে কথিত জাতীয় উন্নতির মেকি পথে নয়, জনগণের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে জাতীয় অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে সমাজের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে চলমান গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে অগ্রসর করে নেওয়ার ক্ষেত্রে বামপন্থীদের দায়িত্ব অপরিসীম। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে, ভ্রান্তি ও সংকীর্ণতা মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম জারি রেখে আজ যত ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতেই হোক্ বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীনদের আজকের অবস্থান যাই হোক্, ১৯৫৯ সালের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে বামপন্থীদের মিলিত সংগ্রামের সূচনা এবং ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে বামশক্তির প্রাধান্যকেই ঘোষণা করছে। নেপালের ইতিহাসও তাই বলে। তাই বাংলাদেশেও বাম-প্রগতিশীল শক্তির বিকাশ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আসুন ঐক্যবদ্ধ হই এবং ইতিহাস নির্ধারিত সমাজবিকাশের গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে যাই। বাংলাদেশের শোষিত-বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের সামনে বাঁচার স্বপ্ন তুলে ধরি।

জনস্বার্থে টাকা নেই, রপ্তানি ব্যবসায়ীদের জন্য ভর্তুকি ১৪০০ কোটি টাকা

ডলারের তুলনায় টাকার দাম বেড়ে যাওয়ায় রপ্তানিতে লাভ কম হচ্ছে বলে অভিযোগ করার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানিকারক শিল্পপতিদের ১৪০০ কোটি টাকা ভর্তুকি মঞ্জুর করেছে। রপ্তানিপণ্য উৎপাদনের জন্য এমন কিছু উপাদান দরকার হয়, যেগুলি আমদানি করতে হয়। সেগুলি আমদানি করার জন্য শিল্পমালিকরা যে আমদানি শুল্ক দেয়, সেই প্রদত্ত শুল্কের একটা অংশ ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই ফেরত বাবদই ১৪০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

ডলারের তুলনায় টাকার দাম বেড়ে চলেছে — এ নিয়ে ব্যবসায়ী মহলের একাংশ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তা এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক নানাভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে, কেন্দ্রের নয়া আর্থিক নীতি ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কটকে কীভাবে আরও তীব্র করেছে। সাধারণভাবে মনে হতে পারে, ডলারের দাম কমা এবং তুলনায় টাকার দাম বাড়া তো ভাল কথা। কারণ টাকার দাম বাড়লে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, অর্থনীতির স্বাস্থ্য ফিরবে। বাস্তবে বুর্জোয়া অর্থনীতির হিসাবকিতাব আরও জটিল। স্বাভাবিকভাবে টাকার দাম বাড়া মানে জিনিসের দাম কমা। কাজেই টাকার দাম বাড়লে সব জিনিসের দামই কমার কথা। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখতে হবে, সাধারণ অর্থে টাকার দাম কিন্তু বাড়ছে না। যেটা বাড়ছে, সেটা হচ্ছে, ডলারের তুলনায় টাকার দাম। তাই সবরকম পণ্য সাপেক্ষে টাকার দাম বাড়ছে না, বাড়ছে কেবলমাত্র ডলার দিয়ে আমদানি করা পণ্য, বিশেষত বিলাসদ্রব্যের সাপেক্ষে টাকার দাম। তাই সবরকম জিনিসের দাম কমছে না, কমছে কেবল ডলার দিয়ে যেসব জিনিস কেনা হয় তার দাম। বাজারে তার সবগুলির দর কমবে কি না, তা ব্যবসায়ীদের ও পর নির্ভর করে।

টাকার দাম বাড়লে প্রথম সুবিধা আমদানিকারক ব্যবসায়ীদের। ধরা যাক, ১ ডলারের বিনিময় মূল্য ৪৬ টাকা থেকে কমে ৪১ টাকা হল। অর্থাৎ ডলারের তুলনায় টাকার দাম বাড়ল ৫ টাকা। এর ফল কী হবে? ১০,০০০ ডলার মূল্যের আমদানি করা মোটরগাড়ির কেনা দাম ৪,৬০,০০০ থেকে কমে ৪,১০,০০০ টাকা হয়ে যাবে। যদি আমদানি পণ্যের ব্যবসায়ী দাম না কমায়, তবে তার মুনাফা বাড়বে ৫০,০০০ টাকা। আর যদি কিছু দাম কমায় তাহলে ক্রেতা কিছু কম দামে পাবে, বাকিটা ব্যবসায়ী পাবে। এইরকমভাবে আমদানি করা গম বা পেট্রলের কেনা দাম কমবে কিন্তু বাজার দর কমবে কি না তা ব্যবসায়ী ও সরকারের নীতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এজন্য চাল-ডাল-জামা কাপড় প্রভৃতি যেসব পণ্য ডলার দিয়ে কেনা হয় না, তার দাম কমবে না। একই কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমবে তো না-ই, বরং পুঁজিবাদের নিয়মে বাড়বে। বাস্তবে এখন ডলারের তুলনায় টাকার দাম সর্বাধিক। ১ ডলারের বিনিময় মূল্য কমবেশি ৪৬ টাকা থেকে কমে এখন ৪০ টাকা ২২ পয়সা। অথচ বাজারে চাল-ডাল-গম সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ক্রমশ বাড়ছে। দু'চার দিন আগেও সরকার উদ্বেগের সঙ্গে বলেছিল, দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়ছে। এখন বলছে, মুদ্রাস্ফীতি নাকি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। চাল-ডাল, শাক-সবজি, মাছ-তেল, জমি-বাড়ির দাম ক্রমাগত বাড়া সত্ত্বেও সরকারি হিসাবে কী কায়দা করলে খাতাকলমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে, তা একমাত্র সরকারই বলতে পারে।

বস্তুত টাকার দাম বাড়ার কারণ এই নয় যে অর্থনীতির স্বাস্থ্য ফিরেছে। বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের ডলার আয় বেড়েছে। এর আসল কারণ হল, দেশের পুঁজির বাজার বিদেশি পুঁজির সামনে খুলে দেওয়ার ফলে এবং এদেশে মুনাফার হার খুব বেশি বলে, পুঁজির বাজারে হু হু করে বিদেশি পুঁজি আসছে। এই পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে না। বিদেশি পুঁজির বিরাট অংশই আসছে শেয়ার বাজারে, বিশেষ করে পুরনো কারখানার শেয়ার বেচাকেনা করে মুনাফা করতে। সংবাদে প্রকাশ, গত বছর মোট ৮.৮৭ বিলিয়ন ডলার (অর্থাৎ ৮৮৭ কোটি ডলার, বর্তমান মূল্যে প্রায় ৩৫,৬৭৫ কোটি টাকা) বিদেশি পুঁজি এসেছিল শেয়ার বাজারে। এবছর জুলাই মাসের মধ্যেই ৫৭৫ কোটি ডলার এসে গিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, এবছর শেয়ার বাজারে মোট বিদেশি বিনিয়োগ সাড়ে বারোশ' কোটি ডলার ছাড়াবে (সূত্র ঃ পিটিআই রিপোর্ট, স্টেটসম্যান, ২৫.৭.০৭)। এই বিপুল পরিমাণ ডলার আসায় বিপত্তি ঘটছে দু'টি।

প্রথমত, দেশের ভেতর ডলারে কেনাবেচা হয় না। তাই এই বিপুল সংখ্যক ডলার জমা নিয়ে সমপরিমাণ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ছাড়তে হচ্ছে। ফলে বাজারে টাকার যোগান অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে, যার প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে।

দ্বিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে ডলারের যা চাহিদা, তার তুলনায় জোগান অঢেল হওয়ায় ডলারের দাম কমে যাচ্ছে, যেটা বাইরে টাকার দাম বৃদ্ধি রূপে দেখা যাচ্ছে। এর ফল, আমদানি পণ্যের দাম কমা, যার ভোক্তা প্রধানত সাধারণ মানুষ নয়। আর রপ্তানি পণ্যের দামবৃদ্ধি, যার ক্ষতি সরকার মালিকদের ভর্তুকি দিয়ে পূরণ করছে।

শাসকদল এবং সংবাদমাধ্যম প্রতিদিন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে রঙিন চিত্র তুলে ধরে, তা যে কতখানি ভুয়ো, তা এই অস্থিরতা থেকেই প্রমাণিত হয়। দেশে উৎপাদনমুখী শিল্প ক্রমে ডুবছে, মানুষ কাজ হারাচ্ছে। উচ্চহারে মুনাফার জন্য দেশিবিদেশি বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে শেয়ারবাজার ফুলে- ফেঁপে উঠছে। খবরের কাগজের পাতায় রোজই ঢাক পিটিয়ে প্রচার চলছে — শেয়ারসূচক ষোল হাজার পৌঁছাল বলে। দশ টাকার শেয়ার তিনশ' টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ উৎপাদনে বিনিয়োগ সেই দশ টাকাই। বাকি দুশ' নব্বই টাকা

আটের পাতায় দেখুন

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

ইরাক ঃ মার্কিন সেনার মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ছে

ইরাক যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সে দেশের সেনাবাহিনীতেও ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ। এর আগেও মার্কিন সেনাবাহিনীর একাধিক সদস্য নৈতিক দিক থেকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হয়। কিন্তু কঠোর শাস্তি ঘোষণা করেও সৈন্যদের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা ঠেকানো মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে উত্তরোত্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে যথেষ্ট দুষ্কর। সম্প্রতি এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা আবার সামনে এসেছে। যুদ্ধবিরোধী মার্কিন সাধারণ নাগরিক সমাজও সেনাবাহিনীর সেইসব প্রতিবাদী কণ্ঠের পাশে দাঁড়ানোয় তাদের যেমন-খুশি শাস্তি দেওয়াও এখন কর্তৃপক্ষের কাছে আগের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন হয়ে উঠেছে।

যেমন এলি ইজরায়েল। মার্কিন সেনাবাহিনীর জে ভি বি ব্র্যাভো কোম্পানির ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের এই সদস্য কেনটাকি ন্যাশনাল আর্মি গার্ডের একজন সৈন্য। তাঁর কোম্পানির সাথে তিনিও বাগদাদের ক্যাম্প ভিকট্রিতে নিয়োজিত ছিলেন। গত ২১ জুন তাঁর নিজস্ব ব্লগে তিনি তাঁর পরিচয় জানিয়েই লেখেন, কী অসহনীয় অবস্থার মধ্যে তাঁদের দিন কাটাতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে তিনি লেখেন যে, তাঁদের আসল কাজ হচ্ছে, বাগদাদে মার্কিন করপোরেট জগতের প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু তিনি এই কাজ করতে করতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং আর তাঁর পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসার সাথে সাথে তাঁর বিরুদ্ধে 'সরাসরি নির্দেশভঙ্গের' অভিযোগ আনা হয় ও কোর্ট মার্শালের আয়োজন করা হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই বিভিন্ন যুদ্ধবিরোধী গোষ্ঠী, যেমন 'কারেজ', 'রেজিস্ট' বা 'ইরাক ভেটারেনস এগেনস্ট দ্য ওয়ার' তাঁর পাশে দাঁড়ায় এবং তাঁর প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়।

একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে আরও বেশ ক'টি ক্ষেত্রে। গত বছর সেনাবাহিনীর একজন অফিসার, লেফটেনান্ট এরেন ওয়াতাদা নৈতিক কারণে ইরাক যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেন এবং ২০০৬ সালের জুন মাসে প্রকাশ্যে সেকথা তিনি ঘোষণাও করে দেন। দ্রুত তাঁকে কোর্টমার্শাল করা হয় এবং বিচারক প্রথমেই 'নৈতিক কারণ সেই আদালতের বিবেচ্য বিষয় নয়' বলে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর অপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে তাঁকে বর্তমানে দ্বিতীয়বারের জন্য আবার সামরিক আদালতে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার জনমানসে এর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব জাপানি বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা আমেরিকায় বিনাদোষে আটক সাধারণ জাপানিদের মুক্তির দাবিতে সরব হয়েছিলেন, সেইসব বৃদ্ধরাও আজ আবার সংগঠিতভাবেই ওয়াতাদার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

লেনক্স ইয়ারউড হলেন মার্কিন রিজার্ভ এয়ার ফোর্সের একজন অফিসার। তিনি আবার একজন জনপ্রিয় গায়কও। তিনিও নৈতিক জায়গা থেকেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন এবং 'যুদ্ধকে না বলো' বলে একটি জনপ্রিয় গানও রচনা করেন। এই অপরাধেই গত ২৬ মার্চ তাঁকে বাহিনী থেকে অপসারিত করা হয়।

ইরাক যুদ্ধ যে আসলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই স্বার্থে সৃষ্টি, তা নিয়ে আজ আর কোথাও কোনও দ্বিমতের জায়গা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরাও আজ এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে একরকম খড়্গহস্তই। বর্তমানে সেদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যেও এই যুদ্ধ নিয়ে অসন্তোষ, বিক্ষোভ ক্রমাগত বাড়তে থাকা এবং যুদ্ধে যেতেই অস্বীকারের ঘটনায় আশঙ্কিত মার্কিন কর্তৃপক্ষের কপালে ভাঁজ পড়তে বাধ্য এবং তাদের ক্ষিপ্ত আচরণ সেটাই প্রমাণ করে।

জয়নগর কৃষিদপ্তরে বিক্ষোভ

রাজ্যের জলমগ্ন ও বন্যাকবলিত লক্ষ লক্ষ দুর্গত মানুষদের কাছে ত্রিপল, পানীয় জল, খাবার ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রায় কিছুই পৌঁছচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিএম নেতারা রাইটার্সের ঠাণ্ডা ঘরে বসে প্রতিশ্রুতি ও বিবৃতি দিচ্ছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সফরে বেরোচ্ছেন, জনগণের দুর্দশার কোন পরিবর্তন নেই। নিকাশি ব্যবস্থা ও বাঁধ সংরক্ষণের কোটি কোটি টাকা সিপিএম নেতাদের একাংশ এবং বশংবদ ঠিকাদারদের পকেটে যাচ্ছে।

একই চিত্র জয়নগর ২নং ব্লকের। পঞ্চায়েত সমিতি ও বিধায়কদের পক্ষ থেকে নিকাশি ব্যবস্থার জন্য একাধিক বৃহৎ প্রকল্প জেলা পরিষদ ও উর্ধ্বতন প্রশাসনের কাছে বহুদিন আগেই পাঠানো হয়েছে। তা রূপায়ণের জন্য সিপিএম পরিচালিত জেলা পরিষদ ও প্রশাসনের কোন উদ্যোগ নেই। এই ব্লকের কয়েকশ' মানুষের ঘর পুরোপুরি ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজার হাজার বিঘা জমিতে রোয়ার জন্য তৈরি করা বীজতলা। সবজি বাগান ভেসে গেছে, অর্থকরী বহু গাছ ভেঙে পড়েছে, বহু পুকুর ভেসে গেছে। ৬ জুলাই শত শত দুর্গত মানুষকে নিয়ে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। অল্প সংখ্যক ত্রিপল ও কিছু চাল আন্দোলনকারীরা আদায় করতে পেরেছেন, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। ব্যাপক ত্রাণের জন্য এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে আন্দোলন চলছে। গত ১০ জুলাই দেড় হাজার চাষী নতুন করে বীজতলা বোনার জন্য বীজ ধান ও সহায়ক অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর দাবিতে জয়নগর ২নং এডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কমরেড বাসুদেব পুরকাইতের নেতৃত্বে কমরেডস কবিতা সরদার, গোবিন্দ আহিরি, সুখেন মুধা, সামসুল পুরকাইত প্রমুখের এক প্রতিনিধি দল এডিও'র নিকট ডেপুটেশন দেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রূপম চৌধুরী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বাসুদেব পুরকাইত এবং কমরেড আনসার সেখ, অরুণ মণ্ডল প্রমুখ।

মার্কিনী দখলে বিধ্বস্ত আফগানিস্তান

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অধিকৃত আফগানিস্তানের অবস্থা আজ সত্যিই করুণ। পূর্ববর্তী তালিবান জমানার মতোই সাধারণ মানুষের সুস্থ সামাজিক জীবন আজও সে দেশে এক স্বপ্ন মাত্র, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুতুল হামিদ কারজাই সরকারের অস্তিত্ব রাজধানী কাবুলের বাইরে টের পাওয়াই মুশকিল। মার্কিন ও বিদেশি জোট সেনার বন্দুকের নলই এই সরকারের টিকে থাকার একমাত্র গ্যারান্টি। এই দুর্বল পুতুল সরকারের অস্তিত্বের সঙ্কট আজ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটবাহিনীও আজ আর তার উপর খুব একটা ভরসা রাখতে পারছে না। কী করে এই দুর্বল সরকারের অস্তিত্বটুকু অন্তত টিকিয়ে রাখা যায় তা-ই হয়ে উঠেছে আজ জোটবাহিনীর মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গত ১ ও ২ জুলাই ইতালির রাজধানী রোম শহরে ন্যাটোর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আফগান রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই-এর উপস্থিতিতে ন্যাটোভুক্ত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে আলোচনা চালান। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আরও জোরদার সামরিক অভিযান চালানোই এ ক্ষেত্রে সমাধানের একমাত্র উপায়।

অবশ্য তাদের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। চিরকালই স্বৈরাচারী ও সাম্রাজ্যবাদীরা টিকে থাকার শেষ উপায় হিসাবে এই বলপ্রয়োগ ও গা-জোয়ারির পথকে আঁকড়ে ধরে। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। আর বলপ্রয়োগের এই সিদ্ধান্ত সে দেশে অনেক আগে থেকেই কার্যকর করা শুরু হয়ে গেছে।

সাম্প্রতিক একের পর এক ঘটনা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। আর তার অসহায় শিকার সেদেশের নিরীহ জনসাধারণ — বিদেশি জোট সেনার চোখে তাদের সম্মান, সম্পত্তি, এমনকী জীবনেরও কানাকড়ি মূল্য নেই।

পরিস্থিতি যে কতটা ভয়াবহ তার কিছুটা আঁচ পাওয়া গেল খোদ রাজধানী কাবুলেই গত ৬ জুলাই ঘটে যাওয়া এক ঘটনায়। কাবুলের শহরতলীর একটি রাস্তায় সেদিন একটি মার্কিন কনভয়ের উপর আত্মঘাতী হামলা চালানো হলে দু'জন মার্কিন নাগরিক প্রাণ হারান। খবরটি কভার করার উদ্দেশ্যে সাংবাদিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে আতঙ্কিত আফগান পুলিশ ছুটে এসে বলে, 'এখানে এক মুহূর্ত দাঁড়াবেন না। পালান।' কারণ ক্ষিপ্ত মার্কিন সেনারা এতটাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠেছে যে, ঘটনাস্থলে কাউকে দেখলেই নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে দিলে নাকি আশ্চর্যের কিছু নেই।

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এক সুপ্রাচীন অঞ্চল হল হেলমন্দ। ইরান ও পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া এই দুর্গম উষর অঞ্চলটি যুদ্ধবিগ্রহ এবং ইতিহাসের আরও বহু ঘটনার সাক্ষী। গত ২৯ জুন আবার সেরকমই এক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল ঐ অঞ্চল। ঐ অঞ্চলে বিদ্রোহীরা লুকিয়ে আছে এই আশঙ্কায় মার্কিন বিমানবাহিনী সেখানে তীব্র বিমান হানা চালালে অসংখ্য নিরীহ, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের জীবনহানি ঘটে। মার্কিন বিমানবাহিনীর নিজেদের হিসাব অনুযায়ী এই মৃত্যুর সংখ্যা ৪৫। ঐ অঞ্চলের আফগান গভর্নরের মতে অবশ্য নিহতের সংখ্যা কোনওভাবেই ১৩০-এর কম নয়। আসলে মৃত্যু সংখ্যা কত, তা জানাই হয়ে উঠেছে একপ্রকার অসম্ভব। কারণ একে অঞ্চলটি অতি দুর্গম, তার উপর আজ পরিস্থিতি এমন যে ঐ অঞ্চলে কারজাই সরকারের অস্তিত্ব আছে শুধু নামেই। ফলে কোনও সাংবাদিকদের পক্ষেই ঝুঁকি নিয়ে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

ফলে সহজেই বোধগম্য, আজ আফগানিস্তানে কারজাই সরকার বা তাদের পৃষ্ঠপোষক মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটবাহিনীর অবস্থা কতটা সঙ্গীন। আর মরিয়া হয়ে তারা যতই বন্দুককে আঁকড়ে ধরবে, সেদেশে তাদের অবস্থান হয়ে উঠবে ততই সঙ্কটজনক। কিন্তু তাদের এই গা-জোয়ারি শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটানোর প্রক্রিয়ায় আরও কত নিরীহ আফগান জনগণের জীবনহানি ঘটবে কে জানে!

জয়েন্ট এন্ট্রান্সে জালিয়াতির প্রতিবাদ

২৬ জুলাই জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দুর্নীতির প্রতিবাদে কলকাতায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের বিক্ষোভ

ব্যবসায়ীদের জন্য ভর্তুকি ১৪০০ কোটি টাকা

সাতের পাতার পর

বাজারে আসছে সমমূল্যের পণ্য উৎপাদন ছাড়াই। এইভাবে বেলুনের মত ফুলে 'সম্পদবৃদ্ধি' ঘটছে, যার আশু পরিণাম ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ হ্রাস। আর চূড়ান্ত পরিণাম হল বেলুন ফেটে অর্থনীতির দেউলিয়া হয়ে পড়া। দু'ক্ষেত্রেই এর মূল ধাক্কাটা সইতে হয় মেহনতি জনগণকে। আশু পরিণাম হিসাবে মূল্যবৃদ্ধির যন্ত্রণাটা রোজই সইতে হয় সাধারণ মানুষকে। অথচ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সরকার ভর্তুকি দেয় না। বরং রেশনে যতটুকু হ্রাসমূল্যে আগে খাদ্যশস্য পাওয়া যেত, তাও কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দিয়েছে। অথচ ডলারের তুলনায় টাকার দাম বাড়ার ফলে রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতিরা অসন্তোষ প্রকাশ করার সাথে সাথে ১৪০০ কোটি টাকা বের করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন এই পক্ষপাতিত্ব? কারণ, এ সরকার জনগণের নয়, মালিকদের।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in